বাংলাসাহিত্যের কথা

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

বিশ্বভারতী
কলিকাতা

প্রকাশ মাঘ ১৩৪৯
প্রথম সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২
পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৫৯

প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত
বিশ্বভারতী । ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন । কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস । ১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট । কলিকাতা ৪

৫'১

শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর

করকমলে

সূচী

ভাষার কথা ১

সাহিত্যের লক্ষণ ১৪

সাহিত্যের উৎপত্তি ১৭

প্রাচীন যুগ

মনসামঙ্গল কাব্যের তত্ত্ব ২১

মনসামঙ্গল-কাহিনী ২১

প্রাচীন কাব্যের ছন্দ ২৯

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের তত্ত্ব ৩০

চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনী ৩১

কালকেতুর গল্প ৩১

ধনপতি সদাগরের গল্প ৪০

ধর্মমঙ্গল কাব্যের তত্ত্ব ৪৬

ধর্মমঙ্গল-কাহিনী ৪৭

অন্যান্য মঙ্গলকাব্য ৫২

নাথসাহিত্য ৫৩

গোর্খবিজয়-কাহিনী ৫৩

ময়নামতীর গান ৫৮

লোকসাহিত্য ৬৭

খেলার ছড়া ৬৪

ছেলেভুলানো ছড়া ৬৫

বিবিধ ৬৭

ডাক ও খনার বচন ৬৭

প্রবাদবচন ৭০
ব্রতকথা ৭১
গীতিকাব্য ৭৩
অনুবাদ-সাহিত্য ৮১
চরিতকাব্য ৮২
নাটক ও যাত্রাভিনয় ৮২
গদ্য ৮৬

আধুনিক যুগ

গদ্যরচনা ৯১
পদ্যসাহিত্য ৯৩
যাত্রা থিয়েটার ও অপেরা ১০৩
উপন্যাস ও গল্প ১০৯
রঙ্গরচনা ১১৩
কাব্য ১১৪
প্রবন্ধ ১১৫
শিশুসাহিত্য ১১৭
অনুবাদ-সাহিত্য ১১৮
বিবিধ ১১৯
রবীন্দ্রনাথ ১২৩
শরৎচন্দ্র ১২৪

পরিশিষ্ট

ক. কয়েকটি অপ্রচলিত শব্দের অর্থ ১২৭
খ. কালানুক্রমণ ১২৯

লেখকের নিবেদন

এই পুস্তকে আমাদের অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকদের জন্যে সরলভাবে প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল। সাহিত্যের কালানুক্রমিক ইতিহাস প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে জটিল ও নীরস বোধ হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই এতে সেভাবে কালক্রমের অনুসরণ না করে শুধু বিষয়বস্তুর প্রতিই লক্ষ রেখেছি। বস্তুত এই বইখানিকে বাংলাসাহিত্যের ধারাবাহিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের ভূমিকা-স্বরূপেই ধরা যেতে পারে। এই পুস্তকপাঠে পাঠকের অন্তরে যদি বাংলাসাহিত্যের প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ জন্মে তা হলেই আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবে।

এই বইখানির সম্বন্ধে একটি বিশেষ বক্তব্য এই যে, এখানির খসড়া অনেকদিন আগে কিছু কিছু করে লেখা হয়। শান্তিনিকেতন আশ্রমের পাঠভবনে উচ্চতর বর্গের ছাত্রদের তা থেকে পড়ানো হত। পরে সেই খসড়াখানি সম্পূর্ণ-প্রায় হলে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে দেখতে দিই। তিনি সেখানিতে সংযোজন ও সংশোধন করে তার চেহারাই বদলে দেন। প্রকৃতপক্ষে বইখানি তাঁরই নির্দেশ-অনুসারে লিখিত এবং অংশত তাঁরই রচিত। গুরুদেবের লিখিত অংশগুলি যথাসম্ভব উদ্ধরণচিহ্ন দিয়ে ছাপানো হল।

অল্পবয়স্ক পাঠকপাঠিকাদের কথা মনে রেখে এর বিষয়বস্তু সংকলিত হয়েছে। ইন্‌ফরমেশন হিসাবে বাংলাসাহিত্যের সব দিকের কথা কিছু কিছু করে তাদের জানানো উদ্দেশ্য। কাজেই এতে দু-পাঁচজন বিখ্যাত লেখক আর কতকগুলি নাম-করা বইয়ের পরিচয় বাদ পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় এই বইয়ের পাণ্ডুলিপিখানি দেখে জায়গায় জায়গায় অসংগতিগুলি ঠিক করে সাজিয়ে দিয়েছেন। আর অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করেছেন শ্রীযুক্ত শক্তিরঞ্জন বসু, কানাই সামন্ত, সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ও সুধীরচন্দ্র কর মহাশয়গণ। এঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই বইখানিতে যদি কোথাও কিছু ত্রুটি চোখে পড়ে তবে জানালে বিশেষ অনুগৃহীত হব।

তৃতীয় মুদ্রণের বিজ্ঞপ্তি

এই সংস্করণে প্রাচীনতব গ্রন্থ থেকে ধর্মমঙ্গল আর গোর্খবিজয় কাহিনী-দুটি সংকলন করে দেওয়া গেল। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সাহায্য করেছেন বিদ্যাভবনের উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়। ৮৭ পৃষ্ঠার চিঠিখানি তিনি তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। এজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

চতুর্থ মুদ্রণের বিজ্ঞপ্তি

এই মুদ্রণে অনেক নূতন তথ্য সংযুক্ত হয়েছে। বর্তমান কাল পর্যন্ত বিবিধ বিষয়ের আলোচনা যোগ করে দেওয়া গেল।

ভাষার কথা

"মানুষের জন্ম মায়ের কোলে। বছর তিন-চার তার আশ্রয় সেখানেই। ভাষা এবং বস্তু-জ্ঞানের ভূমিকা এই সময়ের মধ্যে প্রধানত তার মায়ের কাছ থেকে। এইজন্যে তার ভাষাকে মাতৃভাষা বলা যেতে পারে। তা ছাড়া আমরা আজকাল জন্মভূমিকে বলি মাতৃভূমি, সেখানকার ভাষাকে সে-কারণেও মাতৃভাষা বলা সংগত। আমার বিশ্বাস এই মাতৃভাষা শব্দটি ইংরেজি মাদার্ টঙ্গ্ শব্দের তর্জমা। সংস্কৃতভাষায় এই শব্দের চলন দেখি নি। সম্ভবত মাতৃভূমি শব্দটিও ইংরেজি মাদারল্যাণ্ড শব্দ থেকে নেওয়া। য়ুরোপীয় কোনো কোনো ভাষায় মাতৃভূমির পরিবর্তে পিতৃভূমি শব্দেরই চল বেশি।

আজকালকার গভর্নমেণ্টের শাসনে দেশভাগাভাগিতে বাংলাদেশের অনেক অংশ আসাম ও বিহারের মধ্যে গুঁজে দেওয়া হয়েছে। তা হলেও সেখানকার অধিকাংশ লোকেই বাংলা বলে। সব ধ'রে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি লোক বাংলাভাষায় কথাবার্তা বলে।

এই বাংলাভাষাকে রীতিভেদে ভাগ করা যায়। প্রথম কথ্যভাষা, দ্বিতীয় সাধুভাষা। কথ্যভাষায় আমরা পরস্পর কথাবার্তা কয়ে থাকি। কিন্তু বাংলার ভিন্ন ভিন্ন জেলায় কথাবার্তার ছাঁদ একরকম নয়। যেমন তাদের একটা মিল আছে তেমনি তাদের অমিলও নিতান্ত কম নয়। পশ্চিমে বীরভূম থেকে আরম্ভ করে পূর্বে চাটগাঁ পর্যন্ত ভাষার উচ্চারণ, ভঙ্গি এমন-কি, শব্দ-ব্যবহারের তফাত যথেষ্ট। য়ুরোপীয় দেশেও প্রদেশে প্রদেশে ভাষার এরকম স্থানিক রীতিবৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায়। এইরকম প্রাদেশিক ভাষাকে অপভাষা বলা হয়। ইংরেজের দেশে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম বিভাগে অপভাষার ভিন্নতা আছে; সেখানকার

চাষাভুষারা আপনা-আপনির মধ্যে সেই ভাষায় কথাবার্তা চালায়। কিন্তু সেখানে সর্বত্রই ভদ্রসাধারণে যে-ভাষা ব্যবহার করে থাকে সেটাকে বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষা ব'লে স্বীকার করা হয়। এই ভাষার মূল ইংলণ্ডের মধ্যপ্রদেশে, সেখান থেকে তার প্রভাব যে কারণেই হ'ক সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে, এই ভাষাই তার সাহিত্যের ভাষাও বটে। ইটালি দেশেও এর দৃষ্টান্ত আছে। সেখানকার সব অপভাষাকে পিছনে রেখে টস্‌কানি দেশের বুলিই ইটালির সাধারণ ভাষা হয়ে উঠেছে, কী লেখা-পড়ায় কী কথা বলায়। এর সুবিধা যে কত, সে আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই।

বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অপভাষা আছে। একসময়ে রেলগাড়ির ব্যবস্থা ছিল না, চলাফেরা মেলামেশার সুযোগ ছিল সংকীর্ণ, সেই অবস্থায় অপভাষাগুলি শক্ত হয়েছিল যেন পাঁচিলে ঘেরা। এমন সময়ে ইংরেজের আমলে কলকাতা হল রাজধানী। পড়াশুনো, ব্যবসাবাণিজ্যে, আমোদপ্রমোদে অনেক কাল ধরে কলকাতা দেশের চারিদিক থেকেই লোক টেনে আনত। এমনি করে সকলের মিলনে রাজধানীর একটা ভাষা জেগে উঠল। সে-ভাষায় ভিত হচ্ছে দক্ষিণ-দেশী বাংলা। এই বাংলাই ক্রমশ বাঙালি ভদ্রসমাজের সাধারণ ভাষা হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, এইরকম একটা সাধারণ ভাষা স্বীকার করে নেওয়া সকল দিক থেকেই ভালো।

আধুনিক বাঙালির এই যে সাধারণ ভাষা অনেক দিন পর্যন্ত কথ্য-ভাষার মহলে একঘরে হয়ে আছে তাকে সাহিত্যের আসরে পা বাড়াতে দেখলেই দরোয়ান তাড়া করে এসেছে। অন্য দেশে যে-ভেদ ঘুচে গিয়ে সাহিত্যের ভাষা জীবন্ত এবং কথার ভাষা ঐশ্বর্যময়ী হয় আমাদের এই ভাগবিভেদের দেশে সেটা ঘটে নি। যে-কথার ভাষা যথার্থই মাতৃ-ভাষা তার 'পরে উচ্চশ্রেণীর অবজ্ঞা সাধুভাষা নামটাতেই বোঝা যায়।

অল্প কিছুদিন থেকে আমাদের কথার ভাষা সাহিত্যের দুর্গতোরণ পার হয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ছে— তাকে ঠেকিয়ে রাখা আর চলবে না।

এ কথা মানতে হবে যে, মৌখিক আলাপে আমরা ঢিলে ভাবে কথাবার্তা কই, সাহিত্যে কথার বাঁধুনি থাকা চাই। সাহিত্যের বিষয় অনেক সময় বাক্যালাপের বিষয়ের মতো যা-তা যেমন-তেমন নয়। তাকে ঠিকমত বোঝাতে গেলে চলতি ভাষার শব্দ দিয়ে কাজ চলে না; কাজ চালাতে হয় সংস্কৃত-অভিধান থেকে শব্দ নিয়ে, কিংবা নতুন কথা বানাতে হয় সংস্কৃতব্যাকরণের কথা-বানানো নিয়মগুলি দিয়ে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যে-জীব বা যে-বস্তুকে বের করে দেওয়া হয় তার বিশেষণ সহজ বাংলায় মেলে না। তাড়িয়ে-দেওয়া, খেদিয়ে-দেওয়া. ঝেঁটিয়ে-দেওয়া জিনিস বা জীব শব্দটা সব জায়গায় খাটবার মতো নয়। এখানে 'বহিষ্কৃত' বললে তখনই মানেটা স্পষ্ট হয়ে যায়। এ কথা শুনে যদি কেউ ব'লে বসেন তবেই তো মেনে নিচ্ছ সাধুভাষা নইলে সাহিত্য চলতে পারে না, কথাটা ঠিক নয়। আজকাল আমরা মুখের কথাতেই হ'ক সাহিত্যেই হ'ক, যে নানা বিষয় আলোচনা করি তার প্রয়োজনে সংস্কৃতশব্দ বা পারিভাষিক শব্দের সহায়তা না নিলে নয়। আমাদের শিক্ষার উন্নতিতে আমাদের মুখের ভাষার উন্নতি আপনিই ঘটছে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে চলতি ভাষায় যে-সব কথা বললে লোকে পণ্ডিতিয়ানা ব'লে হেসে উঠত এখন তা আমরা অনায়াসে বলে থাকি। এমনি করেই কথার ভাষা সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠছে, সাহিত্যের ভাষা মিলে যাচ্ছে কথার ভাষায়।

পূর্বকালে আমরা ঘরোয়া কথা নিয়েই পরস্পর আলোচনা করে এসেছি— সেই ছিল আমাদের কথ্য ভাষা। যেই দরকার হল সাহিত্যের অমনি সংস্কৃতের ছাঁচে-ঢালা একটা ভাষারীতি বানানো হল। বানাতে অনেক চেষ্টা এবং অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। এ-বাক্যটা এখন

কানে ঠেকবে না যদি কথার প্রসঙ্গে বলি, 'আজকাল সভ্যজগতে রাষ্ট্র-নৈতিক জটিলতা যতই প্রবল হচ্ছে শান্তির সম্ভাবনা ততই অনিশ্চিত হয়ে উঠছে।' সভ্যজগৎ শব্দটা এর আগে কারো মুখ দিয়ে বেরত না। বাকি অংশটাও সম্পূর্ণ সাহিত্যিক জাতের। অথচ হাল রীতিতে, কথ্যে সাহিত্যে এই মিলনকে অসবর্ণ মিলন বলবে না।

একসময়ে বাংলাসাহিত্যে 'গুরুচণ্ডালী দোষ ব'লে একজাতীয় দোষ নিন্দনীয় ছিল। প্রাকৃত বাংলা এবং সংস্কৃত বাংলাকে একপংক্তিতে বসানোকেই বলত গুরুচণ্ডালী। মনে করো যদি লেখা যায়, 'তার মধ্যম ছেলেটি তুপুর রাত্রে সমুদ্রে লাফ দিয়ে প'ড়ে আত্মহত্যা করেছে'— তবে এই বাক্যটির 'গুরুচণ্ডালী দোষ সংশোধন করতে হলে লিখতে হবে, 'তাঁহার মধ্যম পুত্রটি রাত্রি দ্বিপ্রহরে সমুদ্রে লম্ফ প্রদান পূর্বক আত্মহত্যা করিয়াছে।' এখনকার দিনে এই সংশোধনের কেউ প্রয়োজন বোধ করে না, কেননা এখন কথ্যভাষা আর সাধুভাষা কাছাকাছি এসে পড়েছে, এদের ভেদ আর থাকবে না।

বাংলায় এমন একটি ভাষা বানানো হয়েছে যা বাংলার কোনো জায়গাতেই কথাবার্তায় চলে না, কেবল চলে লিখতে কিংবা বক্তৃতা করতে। লেখার ভাষায় কেউ যদি বক্তৃতা করে বা কথা কয় তা হলে শুনলে লোকে হাসবে।

সাধুভাষাকে কবে বানানো হয়েছে, কারা বানিয়েছে তা স্পষ্ট করে বলা শক্ত। এমন সময় ছিল যখন গদ্যভাষায় লেখা সাহিত্য ছিলই না। তখনকার কালের যে-সাহিত্য আমরা পাই তা পদ্যে। এই পদ্যভাষার এমন একটা ঐক্য বেঁধে গিয়েছিল যাকে বাংলাদেশের সকল জেলার লোকেই স্বীকার করে নিয়েছে। বর্তমানে যাকে সাধুভাষা বলা হয় এই সাধারণ পদ্যভাষাকে তার ভিত বলা ঠিক চলে না। তার রীতিপদ্ধতি বিশেষভাবে পদ্যেরই। প্রথমত তার বাক্য সাজানোর বাঁধা নিয়ম

নেই, ছন্দের খাতিরে তার কর্তা-কর্মের আসন সর্বদাই উলটেপালটে দেওয়া হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিই :

কার সনে নাহি জানি করে বসি কানাকানি
সাঁঝবেলা দিগ্‌বধূ মরমর স্বরে।
আঁচলে কুড়ায়ে তারা কী লাগি আপনহারা
বরমালা মানিকের গাঁথে কার তরে।

এই কটা লাইনকে সাধুভাষায় ঢালাই করতে গেলে আগাগোড়া বদল করতে হবে। যথা— সন্ধ্যাবেলায় দিগ্‌বধূ কাহার সহিত বসিয়া মর্মরস্বরে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছে তাহা জানি না। জানি না, কী কারণে ও কাহার জন্য আত্মহারা অবস্থায় সে আপন বস্ত্রাঞ্চলে নক্ষত্র সংগ্রহ করিয়া মাণিক্যের বরমাল্য গ্রন্থন করিতেছে। কর্তা-কর্মের উলটপালট তো আছেই তার উপরে সনে, তরে, লাগি প্রভৃতি অব্যয় শব্দ সাধু-অসাধু কোনো গদ্যে চলে না। তা ছাড়া 'বসিয়া'র জায়গায় 'বসি', 'কুড়াইয়া'র জায়গায় 'কুড়ায়ে' গদ্যে অসহ্য। সাধুভাষায় কেউ কখনো কানাকানি করে না, করে বিশ্রম্ভালাপ। সাঁঝবেলা শব্দটা গ্রাম্য ভাষায় কোনো কোনো শ্রেণীর মুখে চলে কিন্তু সাধুভাষার চৌকাঠ মাড়াতে পারবে না। এর থেকে দেখা যায় বাংলায় পদ্যের ভাষারও স্বাতন্ত্র্য আছে।

ছড়াজাতীয় কবিতা আছে, জনসাধারণের মুখে মুখে তার উৎপত্তি, তা কথ্যভাষা ঘেঁষা। যথা :

চিকন চুলের মেঘ মেলেছে পদ্মদিঘির রানী,
মুখের থেকে চুরি গেল চাঁদনি হাসিখানি।"

শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কলকাতা ও তার আশেপাশের সাহিত্যভাষাকে ভিত্তি করেই আদর্শ কথ্যভাষা গড়ে উঠেছে এবং এই আদর্শ কথ্যভাষাই আজকাল সাহিত্যের বাহন ব'লে স্বীকৃত হয়েছে। মনে হতে পারে

এই কথ্যভাষায় লেখা বইগুলি বুঝি এদিককার লোকেই বোঝে, অন্যদিকের লোকেরা বোঝে না। কিন্তু তা নয়, এই কথ্যভাষা সব জেলার অধিকাংশ লোকেই বোঝে। কারণ সব জেলা থেকেই কেউবা লেখা-পড়ার জন্যে, কেউ কেউবা ব্যবসা বাণিজ্য বা চাকরির জন্যে কলকাতায় আসেন, বাসও করেন। তার ফলে তাঁদের দক্ষিণী ভাষার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। শিক্ষিত লোকেরা এদিককার কথ্যভাষা বেশ বলতেও পারেন।[১]

যাই হোক, এই বাংলাভাষার গৌরব এখন কম নয়। ভারতবর্ষের যত ভাষা আছে সে-সকলের মধ্যে ভাবসম্পদে ও সাহিত্যসম্পদে এই ভাষা সর্বপ্রধান।

দেখা যায়, আমরা যে খাদ্য খাই, তাতে আমাদের জীবনরক্ষা হয়। কিন্তু সেই খাদ্য নিছক একজাতীয় নয়। ভাতের সঙ্গে নানাপ্রকার তরি-তরকারি, তা ছাড়া মিষ্টান্নও খেয়ে থাকি। উপকরণবৈচিত্র্যে ভোজের গৌরব বাড়ে।

ভাষাও আপন শক্তি বাড়াবার জন্যে তেমনি বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন দেশের ভাষা থেকে শব্দ আত্মসাৎ করে থাকে। সংস্কৃতভাষা, যাকে আমরা দেবভাষা বলি, সে-ভাষাও গ্রীক্‌, পারস্য, দ্রাবিড় প্রভৃতি অনেক ভাষার কথা দখল করেছে। সেই-সব কথাগুলিকে আমরা ধরতে না পেরে সংস্কৃত বলেই মনে করি।

ঠিক এমনি আমাদের বাংলাভাষাতেও পালি, প্রাকৃত, আরবি, ফারসি, পর্টুগিজ, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষার বহু শব্দ আছে। এতে ভাষার উন্নতিই হয়েছে। আজকালও অনেক বিদেশী ভাষার কথা বাংলায় এসে

১ রাজধানী ও তার আশেপাশের জায়গার ভাষা যে সমগ্র দেশের সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠতে পারে তার নজির রয়েছে ইংরেজিভাষায়। লণ্ডনিভাষাই সমস্ত ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসম্বন্ধে বিশেষ জিজ্ঞাসুরা এডোয়ার্ড দি ফার্স্টের সময়কার ইতিহাস দেখতে পারেন।

ঢুকছে। সেগুলিকে আমরা বাদ দিতে পারি নে। বাদ দিলে হয়তো কাজ চলে না ; দু-একটা উদাহরণ দিই :

তাঁবু, খাজনা, চশমা, খবর ;
আনারস, জানালা, বোতল, চাবি, বাল্‌তি ;
হাঁসপাতাল, বেঞ্চি, ডাক্তার, গেলাস।

এই তেরোটা কথা সবাই জানে। সবাই এগুলির মানেও বোঝে। কিন্তু এর মধ্যে প্রথম চারটে ফারসি, মাঝের পাঁচটা পর্টুগিজ্‌ আর শেষ চারটে ইংরেজি। এগুলি বাংলার সঙ্গে মিশে বাংলা হয়ে গিয়েছে। চাবি কথাটার বদলে অন্য কোনো কথা বলতে পারা যায় কি। এরকম বিদেশী কথা বাংলার মধ্যে অনেক আছে। নানা ভাষা থেকে কথা নিতে নিতে ভাষার শক্তি বাড়ে। তবে মনে রাখতে হবে যে, এক দেশের কথা অন্য দেশের ভাষায় গেলে উচ্চারণ বদল হয়ে যায়। যেমন— ইংরেজি হস্পিটাল, বাংলায় হাঁসপাতাল হয়েছে, তেমনি গ্লাস গেলাস, জেনারেল জাঁদরেল হয়েছে। এরকম অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। অন্য ভাষা থেকে যত কথাই আসুক না কেন, বাংলার বেশির ভাগ শব্দ এসেছে সংস্কৃত আর প্রাকৃতভাষা থেকে। এর মধ্যে কতগুলি শব্দ সংস্কৃতে আর বাংলায় একই বানানের। যেমন— গদ্য, পদ্য, কবিতা, পুস্তক, হস্ত, বিধি, আরম্ভ, মানসিক প্রভৃতি। কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এ-স্থলে উচ্চারণ এক নয়। যেমন— গদ্য পদ্য শব্দের বাংলা উচ্চারণ গোদ্দো পোদ্দো। কবিতা শব্দের ‘ক’-এ যে-অকারের প্রয়োগ, বাংলায় সে-অকার একেবারেই নেই, আ ছোটো করে উচ্চারণ করলে তবে সংস্কৃতভাষার অ পাওয়া যায়। তা ছাড়া, কবিতা শব্দে যে ‘ব’ আছে সে বাংলায় মিলবে না। হাওয়া শব্দের ওয়া উচ্চারণ সংস্কৃত (অন্তস্থ) বশয়ের সমান। আবার কবিতা শব্দে ‘তা’-এ যে আ লাগাই তা সংস্কৃত উচ্চারণ হিসাবে খাটো।

"দীর্ঘস্বর বাংলাবানানে আছে, কিন্তু উচ্চারণে নেই বললেই হয়। আমরা ঈশান শব্দে লিখি দীর্ঘ ঈকার কিন্তু উচ্চারণ করি হ্রস্বই।[১] সংস্কৃতের মূর্ধন্য ণ, মূর্ধন্য ষ, দন্ত্য স বাংলায় নেই। তা ছাড়া, সংস্কৃতে যেসব শব্দের শেষবর্ণ অকারান্ত অনেকস্থলেই আমরা তাকে হসন্ত করে বলি। যেমন— জল্, রমেশ্। রামচন্দ্র শব্দের শেষবর্ণ যেমন স্বরান্ত, রাম শব্দেরও তেমনি হওয়া উচিত; কিন্তু আমরা বলি রাম্চন্দ্রো।

প্রচলিত বানানের উপরে চোখ রেখে আমাদের ভ্রম হয় যে, বাংলাভাষায় বিশুদ্ধ সংস্কৃতশব্দ বিস্তর আছে। কিন্তু উচ্চারণ অনুসারে বানান করলেই দেখা যায় প্রায় তার সমস্তগুলিই বিকৃত। এইরকম বানানে একটি বাংলাবাক্য লিখে দেখা যাক:

—ওদ্দো স্পেন রাজ্জে জে ভীশোন যুদ্ধো শংখোটিতো, তার দুক্খো ওতি অশোজ্ঝো, শোব্ভো দেশের জোগ্গো নয়"—[২]

অনেক বাংলাশব্দ সোজাসুজি সংস্কৃত থেকে না এসে প্রাকৃতের ভিতর দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে এসেছে। যেমন— সংস্কৃত হস্ত শব্দটি প্রাকৃতে হয়েছে হত্থ। হত্থ থেকে বাংলায় হয়েছে হাত। সর্প থেকে সপ্প, সপ্প থেকে সাপ। মস্তক থেকে মত্থঅ, মত্থঅ থেকে মাথা। আরও একরকম শব্দ আছে যেগুলি সংস্কৃত বা প্রাকৃত থেকে আসে নি সেগুলি দেশী। যেমন— ধামা, ঝুড়ি, ঝাঁটা, ঠ্যাং, গোড়া, গোঁজ, কাতুকুতু, হাঁচি প্রভৃতি।

আইন-আদালত সংক্রান্ত অধিকাংশ কথাই ফারসি বা আরবি। তার কারণ মধ্যযুগে সুলতান ও বাদশাদের আমলে ফারসিই রাজভাষারূপে

১ তেমনি ঊরু, ঊনর শব্দে দীর্ঘ ঊকে হ্রস্ব উ উচ্চারণ করি। সংস্কৃতে এ ঐ ও ঔ এই চারটি দীর্ঘ স্বর। বাংলাতে (প্রাকৃতেও) এগুলির হ্রস্ব উচ্চারণও আছে।

২ কাজেই বাংলায় উচ্চারণের দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায় 'সংস্কৃত সম' (তৎসম) নামক শব্দ বাংলায় প্রায় নেই-ই, 'তদ্ভব' শব্দই প্রায় সব।

স্বীকৃত হয়েছিল। ওই সুলতান ও বাদশারা জাতিতে ছিলেন তুর্কি। কিন্তু তুর্কি ভাষার পরিবর্তে তাঁরা ফারসি ভাষাকেই রাজকীয় ভাষা ব'লে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আবার ফারসি ভাষাতে অনেক আরবি কথাও ঢুকে গিয়েছিল। তাই ফারসি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে অনেক আরবি শব্দও বাংলাভাষায় এসে গেছে। শুধু রাজকার্য নয়, তৎকালীন ফারসি সাহিত্যের প্রভাবেও ফারসি শব্দের আমদানি হয়েছে। মোট কথা, যে-সব কারণে আজকাল ইংরেজি শব্দ বাংলাভাষায় গৃহীত হচ্ছে, ঠিক সে-সব কারণেই তৎকালে ফারসি ও আরবি কথার আবির্ভাব ঘটেছিল। যেমন— খাজনা, পেয়াদা, বন্দোবস্ত, জরিপ, জমিদার, রায়ত ইত্যাদি। এ ছাড়া নিত্যপ্রচলিত বিস্তর শব্দ বাংলায় আছে যা ফারসি বা আরবি। যেমন— নেহাত, বিলাত, তারিখ, হপ্তা, ফরমাশ, কবুল, বেহায়া, মেজাজ, বদমায়েশ ইত্যাদি। ফারসি ও আরবি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু তুর্কি কথাও বাংলায় এসেছে। যথা— বাবুর্চি, দারোগা, কাঁচি, কাবু, বোঁচকা, আলখাল্লা, কুলি, বাহাদুর, বিবি, বেগম ইত্যাদি। এ-সব শব্দেরও মূল উচ্চারণের অনেকস্থলে হয়েছে বদল। বাংলায় অনেক য়ুরোপীয় শব্দও বেমালুম ঢুকে পড়েছে। যেমন— আলমারি, দেরাজ, টেবিল, কামিজ, পুলিস, জেল, ইস্টেশন ইত্যাদি।

আধুনিক বাংলাসাহিত্যের উৎপত্তিকাল থেকেই সংস্কৃতভাষার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটেছে। এই কারণে সংস্কৃতের রচনারীতি বাংলাকে অনেকটা প্রভাবিত করেছে, তথাপি সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার অমিলই বেশি।

এখানে বাংলাভাষার এইরকম স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। সংস্কৃতে বিশেষ কয়টি জায়গা ছাড়া অন্যত্র দুটো স্বরবর্ণ পাশাপাশি থাকলে উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয়ে যায়। যেমন— শশাঙ্ক, প্রত্যেক প্রভৃতি। বাংলায় এ-নিয়ম খাটে না। খাঁটি বাংলায় সন্ধি

নেই বললেই চলে। কেবল বারেক, তিলেক, অর্ধেক, হরেক, আরেক, একেক, দশেক প্রভৃতি কয়েকটি কথায় সন্ধি আছে। তাও আবার সংস্কৃত নিয়মে নয়। এ-সব স্থলে সংস্কৃতে বারৈক, তিলৈক, অর্ধৈক হওয়া উচিত।

এ, তে, য়, কে, রে, র, এর এই কয়টি বাংলাবিভক্তি; এগুলি দিয়ে কারক প্রকাশ করা হয়। যেমন— বাঘে (বা বাঘেতে) মানুষ খায়। এখানে এ অথবা এতে যোগ করে কর্তাকে বুঝাল। তেমনি আগুনে (আগুনেতে) হাত পুড়ে গেছে, এখানে করণকারক, আর ঘরে (ঘরেতে) টেবিল আছে, এখানে অধিকরণকারক বুঝাল। তিন জায়গাতে এ বা এতে যোগ করা হয়েছে।

কর্মপদে কোথাও বা কে অথবা রে যোগ করা হয়। বেশির ভাগ শব্দেই 'কে' থাকে না। যেমন— সে রামকে দেখছে। কিন্তু সে ভাত খাচ্ছে, চিঠি লিখছে ইত্যাদি। সম্প্রদান বুঝাতে 'কে' বিভক্তি সব সময় যোগ করা হয়। যেমন— এটা রামকে দাও। জন্য, থেকে, চেয়ে, হতে প্রভৃতি শব্দগুলি বিভক্তি নয়, কিন্তু কারক-প্রকাশক। এরকম কারক-প্রকাশক আলাদা শব্দ সংস্কৃতে নেই।

বাংলায় দ্বিবচন নেই, সংস্কৃতে আছে। টা, টি, খানা, খানি, গাছা, গাছি, একবচনে প্রযুক্ত হয়। এগুলি বাংলার নিজস্ব। ছেলেটা ছেলেটি, কাপড়খানা কাপড়খানি, ছড়িগাছা ছড়িগাছি প্রভৃতি আমরা অনবরতই বলে থাকি।

আবার বহুবচনে রা, এরা, গুলি, দিগ, দের যুক্ত হয়। রা, মানুষ প্রভৃতি উচ্চ জীববাচক শব্দের বহুবচনে প্রায়ই প্রযুক্ত হয়। যেমন— ছেলেরা, মুনিরা, দেবতারা ইত্যাদি। কিন্তু ঘাসেরা বা ঝুড়িরা বলা হয় না; এসব স্থলে 'গুলি' শব্দ প্রয়োগ করা হয়। একটু অবজ্ঞা বোঝাতে 'গুলি'র স্থলে 'গুলো' বলা হয়। ছেলেগুলো, গোরুগুলো ইত্যাদি।

কর্মে, সম্বন্ধে— দিগকে, দিগের, দের যোগে বহুবচন সূচিত করে। যেমন— বালকদিগকে, বালকদিগের, বালকদের। কথ্যভাষায় একমাত্র 'দের' শব্দই প্রযোক্তব্য। যেমন— ছেলেদের দেখো, ছেলেদের দাও, ছেলেদের বইপত্র। রবীন্দ্রনাথ স্থলবিশেষে 'দেরকে' বিভক্তি ব্যবহার করার পক্ষপাতী। যথা— আমাদেরকে তোমাদের খাওয়াতে হবে।

সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গশব্দের বিশেষণেও স্ত্রীলিঙ্গবোধক প্রত্যয় যোগ করতে হয়। যেমন— আনন্দিত বালক, আনন্দিতা বালিকা। বাংলায় 'বতী' 'মতী' (কখনো কখনো ঈ) ছাড়া স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণে স্ত্রীলিঙ্গ-বোধক প্রত্যয় প্রায়ই যোগ করা হয় না। সেজন্য—'আনন্দিত বালিকা,' বা 'মা দুঃখিত হলেন' বলা চলে। বোকা ছেলে, বোকা মেয়ে, চালাক ছেলে, চালাক মেয়ে প্রভৃতি খাঁটি বাংলাবিশেষণে স্ত্রীলিঙ্গবোধক কোনো প্রত্যয় বসে না।

বিশেষ্যের বেলাতেও অনেকস্থলে কোনোরকম প্রত্যয় ব্যবহার না করে স্ত্রীজাতি বোঝানো হয়। যেমন— বেড়াল, মাদি বেড়াল ; ছাগল, মাদি ছাগল প্রভৃতি। তবে সংস্কৃতের মতো ঈ, ইনী বা নী প্রত্যয় যোগ ক'রেও স্ত্রীত্ববোধক শব্দ গঠন করা হয়। যেমন— মামী, পিসী, সিংহিনী, কলুনী, জেলেনী ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদে বাংলায় অন্য ক্রিয়া যোগ ক'রে ক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করা হয়। যেমন—বসে পড়ল, ব'লে উঠল, করে বসল, করে ফেলল, খেয়ে নিল। এ-সব স্থলে পড়ল, উঠল, বসল, ফেলল, নিল ক্রিয়াপদ নিজ অর্থ হারিয়ে পূর্ববর্তী ক্রিয়াগুলির অর্থকেই বিশেষিত করছে।

তার পর সংস্কৃতে একই ধাতুর পর নানারকম প্রত্যয় যোগ করে অনেকরকম শব্দ করা যায়। যেমন— গম্ ধাতু থেকে গন্তব্য, গম্য, গমন, দুর্গম, গত, গতি প্রভৃতি কতরকম শব্দ হয়। তেমনি কৃ ধাতু

থেকে কর্তব্য, করণীয়, কার্য, কৃত, কৃতি, করণ, কর্ম, কর্তা, কৃত্রিম, কার, কর প্রভৃতি শব্দ গঠিত হয়। এগুলির মধ্যে অর্থেরও পার্থক্য আছে।

আবার— উপসর্গ যোগ করে, একই শব্দকে বিভিন্ন অর্থে বদলানো যায়। যেমন— কৃ ধাতু থেকে 'কার' শব্দ হল। তাতে উপসর্গ যোগ করে প্রকার, আকার, বিকার, সংস্কার, অধিকার, অপকার, উপকার প্রভৃতি কত অর্থের শব্দ তৈরি করা গেল। সংস্কৃতে এইরকম অনেক শব্দ একই ধাতু থেকে তৈরি করা যায়। এই কারণেই সংস্কৃতের উপর বাংলার নির্ভর অপরিহার্য। খাঁটি বাংলায় তা হয় না। যেমন— ঠ্যাল্ ধাতু, তার থেকে ঠ্যালন, ঠেলিতব্য প্রভৃতি কিছুই হবে না। তেমনি চাহ্, কহ্, বল, থাম প্রভৃতি বাংলাধাতু থেকে কোনো প্রত্যয় যোগ করে শব্দ তৈরি করা মুশকিল। এগুলি কেবল ক্রিয়াপদেই চলে। যেমন— চাকরে গাড়ি ঠেলছে, টাকা চাচ্ছেন, কথা কইছেন ইত্যাদি। তবে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বাংলাধাতু থেকে বিশেষ প্রত্যয় যোগে শব্দ তৈরি হয় বটে। তার গোটাকয়েক নমুনা দেওয়া যাক :

আ— পড়া. চলা, বলা, ধরা
অন— বাঁধন, নাচন, কাঁদন
আনো— চালানো, কাঁদানো, বাড়ানো
নি— চালনি, খাটনি, চাটনি
তি— কম্‌তি, বাড়তি, ফিরতি

এইরকম কতগুলি শব্দ বাংলাতে আছে।

একই ধাতুতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ বাংলার একটি বিশেষত্ব। সংস্কৃতে উপসর্গ-যোগে ধাতুর অর্থ বদলায়, বিনা উপসর্গে দু-তিনটের বেশি অর্থ হয় না। কিন্তু বাংলায় নীচের উদাহরণগুলি দ্রষ্টব্য :

ধরা— মাথা ধরা, চোর ধরা, কলম ধরা, মুখ ধরা, বৃষ্টি ধরা, মনে ধরা, হাত ধরা, উনান ধরা ইত্যাদি।

লাগা— কাজে লাগা, ভালো লাগা, নৌকা লাগা, চোখ লাগা ইত্যাদি।

উঠা— চুল উঠা, গোঁফ উঠা, কথা উঠা, চোখ উঠা ইত্যাদি।

এই-সব স্থলে লক্ষ্য করলেই অর্থের পার্থক্য বেশ বুঝা যায়।

এইরকম নানা দিক দিয়েই দেখলে দেখা যায় বাংলাভাষার যে নিজস্ব চাল আছে তা সংস্কৃতের সঙ্গে মেলে না। সেজন্য বাংলাকে সংস্কৃতব্যাকরণ অনুযায়ী গড়ে তুলতে যাওয়া ব্যর্থ চেষ্টা-মাত্র। সংস্কৃতে ঋ, র্‌ ও ষ্‌ এই তিন বর্ণের পরে দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়; তাই কর্ণে স্বর্ণে মূর্ধন্য ণ কিন্তু বাংলা কান সোনা প্রভৃতি শব্দে ঋ, র্‌, ষ্‌ নেই; তাই ও-সব শব্দে মূর্ধন্য ণ হবারও হেতু নেই।

তেমনি গভর্নমেণ্ট, বোর্নিও আর্নল্ড্‌ প্রভৃতি বাংলা-অক্ষরে লিখলে মর্ধন্য-ণ-য়ে রেফ লেখা অনুচিত।

অনুরূপ কারণেই অসংস্কৃত শব্দে ষত্ববিধানও স্বীকার্য নয়। তাই 'জিনিষ' না লিখে 'জিনিস' লেখাই সমীচীন, বিশেষত আমাদের স-য়ের উচ্চারণই 'শ'-য়ের মতো।

এতক্ষণ ব্যাকরণের কথা বলা হল। এখন আর-একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাক। বাংলাভাষা সংস্কৃত থেকে শব্দ নিয়েছে বটে, কিন্তু অনেকস্থলে তার অর্থ নেয় নি। ভাষা নিজেই তাকে বিশেষ অর্থ দিয়েছে। প্রথমে ধরা যাক—'এবং' শব্দ, এটা খাঁটি সংস্কৃতশব্দ। কিন্তু সংস্কৃতে মানে—'এইরূপ', বাংলায় মানে 'আর'। এইরকম আরো কতকগুলি শব্দ দেওয়া গেল।

শব্দ	সংস্কৃত অর্থ	বাংলা অর্থ
ভাসমান	দীপ্তিমান	জলের উপরে অবস্থিত
অথর্ব	বেদ ও ঋষির নাম	শক্তিহীন
সন্দেশ	খবর	মিষ্টান্ন

শব্দ	সংস্কৃত অর্থ	বাংলা অর্থ
বেদনা	অনুভূতি	ব্যথা
ইতর	অন্য	হীন বা নীচ
উপন্যাস	নিকটে স্থাপন	গল্প
প্রজাপতি	ব্রহ্মা ও কশ্যপ প্রভৃতি	পতঙ্গ বিশেষ
প্রশস্ত	প্রশংসিত	চওড়া
ভাস্কর	সূর্য	পাথরের মূর্তি
রাষ্ট্র	রাজ্য	রটনা করা
বিলক্ষণ	বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত অথবা লক্ষণহীন	বেশি
বিজ্ঞান	জ্ঞান বা বুদ্ধি	সায়ান্স্
সচরাচর	স্থাবর জঙ্গমের সহিত	প্রায়
ব্যস্তসমস্ত	আলাদা ও একসঙ্গে	দেহে ও মনে ত্বরান্বিত

এরকম শব্দ আরো অনেক রয়েছে। "এছাড়া আমরা সংস্কৃতমূলক শব্দ নতুন অর্থে বাংলায় ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছি। যেমন—সমালোচনা, সম্পাদক, সহানুভূতি, জাতীয়তা ইত্যাদি। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে আমাদের রচনার বিষয় বেড়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে আমাদের ভাষাও এগিয়ে চলেছে।"

সাহিত্যের লক্ষণ

"এইবার সময় হয়েছে বিচার করবার, আধুনিক ভাষায় সাহিত্য বলতে আমরা সচরাচর কী বুঝি।

মানুষ যা জানে, তা মনে রাখবার বা অন্যকে জানাবার জন্য স্মরণযোগ্য সুসংলগ্ন ভাষায় গেঁথে রেখেছে। পূর্বাপর চলে আসছে যে-সব

ঘটনা, তার সম্বন্ধে মানুষ যা-কিছু খবর পেয়েছে, তা সে সঞ্চয় করেছে ইতিহাসে, দেশবিদেশের বিবরণ সম্বন্ধে তার জানা বিষয় টুকে রেখেছে ভূগোলে। মানুষ চিন্তা করে যা জেনেছে, বা দেখেশুনে যে-সব খবর পেয়েছে, তা সে ধরে রেখেছে— দর্শনে বিজ্ঞানে, নানাবিধ বর্ণনায়।

কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা কেবল তো জানার বিষয় নিয়ে নয়, সে সুখদুঃখ ভোগ করে, ভক্তি বা ঘৃণা অনুভব করে। এই-সব বোধ নিয়ে তার হৃদয়ের অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাকেও সে স্মরণীয় রূপ দিয়ে নিজের স্বভাবের পরিচয় দিতে চায়। যে-স্বভাব নিয়ে কোনো বিষয়কে তার ভালো লাগে, কোনোটিকে লাগে মন্দ, পূজনীয়কে করে পূজা, নিন্দনীয়কে করে নিন্দা, সুন্দরকে দেখে আনন্দ পায়, অসুন্দরকে দেখে তার বিতৃষ্ণা লাগে। ভাষার ভিতর দিয়ে সেই স্বভাবকে প্রকাশ করবার উপায় সাহিত্য। রামায়ণকে আমরা সাহিত্য বলি। রামচন্দ্রের জীবনের ঘটনা যদি নিতান্ত শুকনো রকম করে টুকে রাখা হত, তা হলে তা সাহিত্য বলে জগতে প্রসিদ্ধ হত না। রামের জীবনবৃত্তান্তকে অবলম্বন করে, কবি ভক্তি. প্রীতি, আশা, নৈরাশ্য, করুণা, জয়োৎসাহ প্রভৃতি নানা ভাবের সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানের বিষয় নিয়ে যে-সব লেখা, তার ভাষা হওয়া চাই স্পষ্ট, অর্থসংগত, যথাতথ, অত্যুক্তি ও অলংকারবর্জিত। কিন্তু হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করতে গেলে তাকে ছন্দ দিয়ে ভাষার ভঙ্গিমা দিয়ে অলংকার দিয়ে সাজিয়ে তুলতে হয়। এমন-কি, ভাষা কিছু অস্পষ্ট করারও দরকার হতে পারে; ভাব-প্রকাশে যথোচিত অত্যুক্তি থাকলেও দোষের হয় না, না থাকলেই বরং ভাবটা মনের মধ্যে প্রবেশের দরজা যথেষ্ট খোলা পায় না।

কবি লিখছেন— লাখো লাখো যুগ তোমাকে হিয়ায় হিয়ায় রাখলুম তবু হৃদয় তৃপ্ত হল না। জ্ঞানের দিক থেকে কথাটা অত্যন্ত অসংগত, পাগলামি বললেই হয়। লক্ষ-লক্ষ যুগ কেউ বাঁচতে পারে এ নিয়ে

তর্কই চলে না। কিন্তু এখানে ভালোবাসার প্রবলতা জানাবার চেষ্টায় মন যখন আঁকুবাঁকু করে তখন প্রকৃত পক্ষে যে-কথাটা অসত্য, ভাবের পক্ষে সেটাই সত্য হয়ে ওঠে। তখন বলবার কথাকে বাঁকিয়ে বাড়িয়ে, সাজিয়ে তার সহজ মানেকে অস্পষ্ট করে দিয়ে সাহিত্য আপন কাজ চালায়। ঠিকমত এ-কাজটি করতে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার দরকার করে। যাঁরা পারেন সমাজে তাঁরা সম্মান পেয়ে থাকেন। মুখ্যত ভাব-প্রকাশের এই ভাষাবাহন হচ্ছে সাহিত্য।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে-সব ব্যাপার স্বভাবতই অপ্রিয়, দুঃখ-জনক, সাহিত্যে মানুষ তাকেও এত মূল্য দেয় কেন, সীতার বনবাস পড়ে চোখের জল ফেলার দরকার কী। এর সহজ উত্তর হচ্ছে, মনের ধর্ম হচ্ছে জানা, এইজন্যে মন সব-কিছু জানতে ভালোবাসে। হৃদয়ের ধর্ম হচ্ছে অনুভব করা, এইজন্য অনুভব করায় তার আনন্দ আছে, নইলে ধৃতরাষ্ট্রের সভাস্থলে দ্রৌপদীর অপমান সে শুনতেই চাইত না। কারো নিজের ছেলে যদি অভিমন্যুর মতো সাত-রথীর মার খেয়ে মরত, তা হলে সে হয়তো পাগল হয়ে যেত। কিন্তু অভিমন্যুর পালা শোনবার জন্যে সে সাত ক্রোশ তফাত থেকে চলে আসে। দুঃখের কারণটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের পীড়াজনক। কিন্তু ব্যবহার থেকে ছিনিয়ে নিলে তার বোধটা আমাদের আনন্দ দিয়ে থাকে। ভূত যদি সত্যি সামনে আসে কোনো ছেলে নেই যে তাতে রস পায়। কিন্তু ভূতের গল্প বলবার জন্যে দাদামশায়কে সে অস্থির করে তোলে। অর্থাৎ যে ভূত প্রত্যক্ষ মারাত্মক তাকে ব্যবহার থেকে বাদ দিয়ে, কেবল তার থেকে ভয়ের বোধটা ছেঁকে নিলে সেটাতে পুলক সঞ্চার করে। অথচ সংসারে ভয় জিনিসটা স্পৃহনীয় নয়, যেহেতু তাতে ক্ষতির আশঙ্কা আছে, সে আশঙ্কা না থাকলে ভয় জিনিসটি থেকে রস পাই। যারা স্বভাবত সাহসী তারা আশঙ্কার কারণ থেকেও আনন্দ পায়, তারা যায় দুর্গম পর্বত লঙ্ঘন করতে, সমুদ্রপার

বিপদের বোধে তাদের আনন্দ। আমার সাহস নেই, তাই প্রত্যক্ষ বিপদের সম্ভাবনাকে পাশ কাটিয়ে পর্বত লঙ্ঘনের বিবরণ যখন পড়ি, তখন মহা উৎসাহ বোধ হয়। বীর মরছে যুদ্ধে, নিজের পক্ষে সেটা আমি একটুও ইচ্ছে করি নে, কিন্তু সাহিত্যে সেই বীরের মরণবৃত্তান্ত কেবল যে পড়ে খুশি হই তা নয়, বুক ফুলিয়ে উচ্চকণ্ঠে তার পালা অভিনয় করেও থাকি। এর থেকে বোঝা যায় মানুষের হৃদয় সকল রকম প্রবল বোধেই আনন্দ পায়। দুঃখবোধের তীব্রতা বেশি বলেই সাহিত্যে শোকাবহ ব্যাপারের 'পরেই তার টান বেশি হয়ে থাকে। তাই বলছি সাহিত্য মুখ্যত মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার নয়, বোধের ভাণ্ডার।”

সাহিত্যের উৎপত্তি

মানুষের রচনার মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো যা পাওয়া গেছে তা হচ্ছে বেদ। এই বেদ সেকালে মুখে মুখে শুনে মুখস্থ করে রাখা হয়েছিল। এইজন্য বেদের আর-এক নাম শ্রুতি। বেদ-রচনার যুগে লেখার চলন হয় নি। শুনে শুনে মনে রাখতে হত ব'লে বেদের অনেক অংশ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সব দেশেরই প্রাচীনতম সাহিত্যের ঘটেছে ওই দশা। কতশত সাহিত্যকথা কালগর্ভে চিরদিনের জন্যে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

মানুষের অতি প্রাচীন সাহিত্যচেষ্টার উদ্ভব কিসের থেকে, তা নিয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত।

“মানুষের জীবন যখন সুরক্ষিত ছিল না, তখন বিপদআপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে মানুষ নানাপ্রকার জাদুমন্ত্রের শক্তি কল্পনা করেছে, তা ছাড়া দেবদেবীকে প্রসন্ন করার 'পরেও তাদের ভরসা ছিল। বিপদ থেকে রক্ষা ও প্রার্থনীয় জিনিস পাওয়ার ইচ্ছা, এবং পেলে তাই নিয়ে

আনন্দ করাতেই মানুষের প্রথম অপরিণত ভাষার চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে। যুদ্ধে জয় প্রভৃতি স্মরণযোগ্য ঘটনা ও যুদ্ধজয়ী বীরদের প্রশংসাবাদ ক্রমশ সাহিত্যকে অধিকার করতে লাগল। এমনি করে ক্রমে ক্রমে মানুষের ভাষা জমে উঠেছে ও তার মুখ খুলে গেছে। আজ পর্যন্ত সে-মুখ আর বন্ধ হল না। সাহিত্যের ধারা দেশে দেশান্তরে বয়ে চলেছে, তার ভেতর দিয়ে মানুষের অভিরুচি, মানুষের অভিলাষ, মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির বিচিত্র ছবি বাইরে প্রকাশ করে দিচ্ছে, এই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন বেড়ে উঠেছে। মানুষের হৃদয়ের মহত্ত্ব তার প্রসার কোন্ জাতের মধ্যে কতদূর এগিয়েছে, তার আনন্দসম্পদের কত বৈচিত্র্য ও মহামূল্যতা তা তার সাহিত্য থেকে প্রকাশ পাচ্ছে।"

প্রাচীন যুগ

মনসামঙ্গল কাব্যের তত্ত্ব

সেকালে পশুর হাতে, মানুষের হাতে আর দৈব দুর্গতিতে বাংলা-দেশের মানুষ যখন নানাপ্রকারে ছিল আতঙ্কিত, তখন তার সে-আতঙ্ক সাহিত্যকেও অধিকার করেছিল, তা স্পষ্টই দেখা যায়। বর্তমান যুগেও ভারতবর্ষেই প্রতি বছরে বারো হাজার থেকে সতেরো হাজার পর্যন্ত লোক মারা যায় সাপের কামড়ে। সেকালে কত যে মরত তার তো কোনো সংখ্যাই পাওয়া যায় না।

ছেলে গিয়েছে মাঠে চাষ করতে সে-ছেলে আর ঘরে ফিরে এল না। সাপের কামড়ে মারা গেল। খেয়ে-দেয়ে গেল শুতে, সে আর জেগে উঠে সকালের সূর্য দেখতে পেল না। রাতে বিছানাতেই সর্পাঘাতে মারা গেল। সাপ আবার এমনি প্রাণী যে, অপ্রত্যাশিতভাবে কোথা থেকে যে এসে পড়ে তার নেই ঠিক। এই-সব নানা কারণে সাপের সঙ্গে একটা অলৌকিক শক্তির যোগ অনেকেই কল্পনা করে থাকে। অন্য প্রাচীন দেশেও তার প্রমাণ আছে।

বর্ষার সময়টাই সাপের উপদ্রব বেশি। কাজেই সাপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাপের দেবতার কৃপালাভ করা নিতান্ত দরকার। এই মনে করে গ্রামে গ্রামে সাপের দেবতার পূজার অনুষ্ঠান হয়।

এই দেবতার নাম মনসা দেবী। ইনি শিবের মেয়ে। এঁর পূজা উপলক্ষ্য করে নানা কবিতে নানারকম গান বেঁধেছেন। এই গানগুলিকে 'ভাসান' গান বলে। এখানে এই ভাসান গানের কাহিনীটা দেওয়া গেল।

মনসামঙ্গল-কাহিনী

চম্পক নগরে ঘর চাঁদ সদাগর
মনসা সহিত বাদ করে নিরন্তর॥
দেবীর কোপেতে তার ছয় পুত্র মরে

তথাপি দেবতা বলি না মানে তাহারে ॥
মনস্তাপ পায় তবু না নোয়ায় মাথা
বলে চ্যাংমুড়ি বেটী কিসের দেবতা।
হেঁদাল লইয়া হস্তে দিবানিশি ফিরে
মনসার অন্বেষণ করে ঘরে ঘরে ॥
বলে একবার যদি দেখা পাই তার
মারিব মাথায় বাড়ি না বাঁচিবে আর ॥

শিব মনসাকে বলেছিলেন, চাঁদসদাগর পূজা না করলে তোমার পূজা জগতে প্রচারিত হবে না। অথচ চাঁদসদাগর শিবের পরমভক্ত, শিব ছাড়া আর কাকেও পূজা করবেন না। মনসা প্রথমে লোভ তার পর ভয় দেখালেন। সাপের কামড়ে ছয় ছেলে মারা গেল কিন্তু সদাগর নিজের জেদ থেকে টললেন না।—

(চাঁদ) এইরূপে কিছুদিন করিয়া যাপন
বাণিজ্যে চলিল শেষে দখিন পাটন ॥
শিব শিব বলি যাত্রা করে সদাগর
মনের কৌতুকে চাপে ডিঙার ভিতর ॥
চাঁদবেনের বিসম্বাদ[১] মনসার সনে।
সাধু কালীদহে দেবী জানিলেন ধ্যানে ॥

চাঁদকে জব্দ করবার জন্যে দেবী ঝড়বৃষ্টি তুললেন—

অবনী আকাশে প্রখর বাতাসে
হৈল মহা অন্ধকার।
গটীয়া গাবর নায়ক নফর
নাহিকো দেখে নিস্তার ॥

১ ঝগড়া।

চাঁদের ডিঙা ডুবল। মাঝিমাল্লা জিনিসপত্র সবই ডুবল।—

চক্ষু রাঙা পেট ভরে খাইয়া চুবনি
তবু বলে দুঃখ দিল চ্যাংমুড়ি কানী ॥

চাঁদ মরলে দেবীর পূজার প্রচার হয় না, তাই দেবী তাকে রক্ষা করলেন। চাঁদ এক-কাপড়ে ভিক্ষা করতে করতে বহু কষ্টে বহু দুঃখে দেশের পানে চললেন।

দেশ দেশান্তরে চাঁদ সদাগরে
অশেষ যন্ত্রণা পায়
পুনর্বার ঘরে সনকা উদরে
লখাই জন্মিল তায়।

চাঁদের স্ত্রীর নাম সনকা। তার অমন ছেলেটি হল। কিন্তু

ললাট কপালে তার বিধি লেখে দুরাচার
বাসরে মরিবে সর্পাঘাতে।

বিয়ের রাতে বাসরে সাপের কামড়ে মারা যাবে এই হল ছেলেটির কপালের লেখন—

চাঁদসদাগর আইলা নিজ ঘর
ডুবাইয়া তরী জলে।
কাতর বেনেনী চক্ষে পড়ে পানি
আপন প্রভুরে বলে॥
শুন সদাগর কোথা মধুকর
কহ তব পায় পড়ি
সাধু হেনকালে সনকারে বলে
কালীদহে হৈল বুড়ি।

আমি নাহি জানি চ্যাংমুড়ি কানী
দুখ দিল নানাপাকে
হৈল ভরা ডুবি ঝাঁপ দিয়া পড়ি
জল খাই নাকে মুখে ॥

তার পর : দেখি পুত্রমুখ সাধুর কৌতুক
সর্ব শোক পাশরিল।
পুত্র কোলে করি চাঁদঅধিকারী
তার মুখে চুম্ব দিল ॥

ছেলেটির নাম লখিন্দর (লক্ষ্মীন্দ্র)। সে পড়াশোনাতে ভালো, দেখতেও খুব ভালো। ক্রমে ক্রমে সে বড়ো হয়ে উঠল।

নিছনি নগরে বেনে সায় অধিকারী
তাহার বনিতা, নাম অমলাসুন্দরী ॥

এদের মেয়েটি ভারি সুশ্রী। ছেলেবেলা থেকে মেয়েটি নাচতে পারত। তার নাম বেহুলা।—

মা বাপের বাটীতে বেহুলা নাচে গায়
বেহুলার গানেতে অমলা মোহ[১] পায় ॥

এই নাচতে পারার জন্যে সকলে তাকে বেহুলা নাচনী বলত। এরই সঙ্গে লখিন্দরের বিয়ের সম্বন্ধ হল। এ-বিয়ের পরিণাম কী চাঁদসদাগর জানেন, জেনেও যথাসাধ্য প্রতিকারের চেষ্টা করছেন। কথা হল বিয়ের রাতে বর কনেরবাড়িতে থাকবে না। সাঁতালি পর্বতে বরের জন্য যে লোহার বাসরঘর তৈরি হচ্ছে তাতে এসে থাকতে হবে। চাঁদ সদাগর এমনভাবে লোহার বাসর তৈরি করলেন যাতে কোনো কিছু

১ মুগ্ধ হয়।

তার ভেতর না যেতে পারে। বাসরের চারি দিকে নানারকম সর্পনিবারক ওষুধপত্র রেখে সাপখেগো পশুপাখি ছেড়ে দিলেন।

যথাসময় লখিন্দর আর বেহুলার বিয়ে হয়ে গেল। বর-কনে সাঁতালি পর্বতে চলে এল। এ দিকে মনসাদেবী বারে বারে সাপ পাঠাতে লাগলেন, যাতে তারা লখিন্দরকে কামড়ায়। বেহুলা জেগে আছেন দেখে তারা ফিরে ফিরে আসতে লাগল।—

লখিন্দর বলে শুন বেহুলা নাচনী
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ ভোখ লাগে ছানি।
রাত্রির ভিতর যদি করাও ভোজন
তবে জানি প্রিয়া মোর রাখিল জীবন।
বেহুলা বলেন ওহে মম প্রাণনাথ
লোহার বাসরে বন্দী কোথা পাব ভাত।

যাই হ'ক একটা উপায় তো করতে হবে। তাই বেহুলা :

মঙ্গল মাঙ্গল্য ছিল মঙ্গলিয়া হাঁড়ি
তিন নারিকেল দিয়া সাজায় তেগুঁড়ি।

নারকোলের জল দিয়ে বরণডালার চালে, নিজের চাদর ছিঁড়ে জ্বাল দিয়ে তিনি রান্না করতে আরম্ভ করলেন।—

নেতের অঞ্চল ছিঁড়ি জ্বালিল আগুন
হেথায় দেবীর ক্রোধ বাড়িল দ্বিগুণ।

দেবীর মায়ায় বেহুলার চোখে ঘুম এল।

কালনিদ্রা হৈল তার দেবীর মায়ায়
ঢলিতে ঢলিতে বামা[১] প্রভুরে জাগায়।

১ সুশ্রী নারী।

তখন : বাসরে প্রবেশ কৈল সে কালনাগিনী
বেহুলা লখার রূপ দেখিল আপনি।
বিষদন্ত দিয়া কালী[1] খাইল তার পায়
দুর্লভ লখাই জাগে বিষের জ্বালায়॥
জাগহ ওহে বেহুলা সায়বেনের ঝি
তোরে পাইল কালনিদ্রা মোরে খাইল কি।

ভোর হতে না হতেই লখিন্দর মারা গেলেন। সমস্ত নগর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কপালের লেখা কে খণ্ডায়। বেহুলা তার সদ্যোমৃত স্বামীকে নিয়ে কলার ভেলাতে চড়ে, তাঁকে বাঁচিয়ে আনবেন প্রতিজ্ঞা করে, গাঙুড় নদী দিয়ে ভেসে চললেন। নদীর দু-ধারের লোক অশ্রুপূর্ণ চোখে এই করুণ দৃশ্য দেখতে লাগল।

পথে কত বিপদ কত আপদ, কত বিভীষিকা। বেহুলা কিছুতেই বিচলিত হলেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ধর্মবলে তিনি স্বামীকে বাঁচিয়ে আনবেন। ভেসে যেতে যেতে স্বর্গের ধোপানী নেতার সঙ্গে বেহুলার সাক্ষাৎকার ঘটল। এই নেতা আবার মনসারও প্রিয়সখী। বেহুলা নেতার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন।—

নেতা বলে শুন রামা পদ ছাড় মোর
কহ দেখি মোরে যত পরিচয় তোর।
সবিনয়ে বলে সব বেহুলা নাচনী
অশেষ পাপের ভাগী আমি অভাগিনী।
বেহুলার লোচনে দেখিয়া শোকজল
নেতাই ধোপানি বলে হইয়া বিকল।

১ সাপ।

পদ ছাড় শুন রামা বিলম্ব না সয়
ত্বরায় যাইতে চাই দেবতা আলয়।

বেহুলাকে নিয়ে নেতা স্বর্গে গেলেন। সেখানে বেহুলা নাচলেন। তাতে সমস্ত দেবতা খুব খুশি হলেন। শিব সেই সভাতে ছিলেন। তিনি বেহুলার সমস্ত কথা শুনে মনসাকে ডাকিয়ে এনে বেহুলার স্বামীকে বাঁচাতে বললেন।

মনসা লখিন্দরকে বাঁচিয়ে বেহুলাকে বর দিতে চাইলেন। বেহুলা বর চাইলেন তার ছয় ভাশুর যমালয় থেকে ফিরে আসুক আর চাঁদসদাগরের সেই যে-সব ডিঙা ডুবে গেছে সেগুলি ভেসে উঠুক। মনসার বরে তাই হল। কিন্তু কথা রইল- বেহুলা ফিরে গিয়ে চাঁদকে দিয়ে মনসার পূজা করাবেন। সকলকে নিয়ে বেহুলা ফিরলেন—

নগর নিকটে আইল আপনার দেশ
স্বর্গের কিন্নরী হেন বেহুলার বেশ।
লখার দ্বিগুণ রূপ দেবীর কৃপায়
বেহুলা সাবিত্রী যারে মনসা সহায়।

চাঁদবেনে সব ঘটনা শুনে বললেন :

কোথা সে বেহুলা মোর কোথা সে লখাই
মরা পুত্র জীয়ন্ত পুরীতে যদি পাই,
তবে সে পূজিব আমি মনসার বার,
শুনিঞা হরষ হৈল পুরে যত তার।
দেখিয়া শুনিয়া সভার বাড়িল উল্লাস,
হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ।

এর পর চাঁদসদাগর ধুমধাম করে মনসার পুজা করলেন। কিন্তু বাঁ হাত দিয়ে মনসাকে পূজা করলেন। কেননা, চাঁদ বললেন,

যে-হাত দিয়ে শিবের পূজা করি সে-হাত দিয়ে আর-কারো পূজা করব না। মনসা চাঁদের হাতে পূজা পেলেন। তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হল আর তখন থেকে পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচলিত হল।

এই হল মনসামঙ্গলের মোটামুটি গল্পটা। মনসার এক নাম পদ্মা, সেজন্যে পদ্মাপুরাণ, মনসা বিজয়, মনসামঙ্গল, মনসার ভাসান প্রভৃতি নানা নামে এই একই গল্প প্রচলিত।

এই কাহিনী অবলম্বন করে বিপ্রদাস, হরিদত্ত, নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ, বিষ্ণুপাল, কালীদাস, রসিকমিশ্র, বংশীদাস প্রভৃতি অনেক কবিই মনসামঙ্গল অর্থাৎ মনসাগানের পালা রচনা করেছেন। তার মধ্যে পূর্ববঙ্গে বিজয় গুপ্তের, আর দক্ষিণবঙ্গে ক্ষেমানন্দের রচিত পালাই চলে, লোকেও শুনতে ভালোবাসে। আজকাল এই বই দুখানি ছাপানোও হয়েছে।

শোনা যায় একবার বংশীদাস গান গেয়ে ফিরছিলেন। পথে ডাকাতের দল তাঁকে ধরল। তিনি বললেন, আমাদের যা আছে সব নিয়ে ছেড়ে দাও। ডাকাতের সর্দার কেনারাম বলল, তোমরা আমাদের চিনে নিলে, অনেক জায়গায় তোমরা ঘোরো, ছেড়ে দিলে আমাদের ধরিয়ে দিতে পার, কাজেই তোমাদের মেরে ফেলা ছাড়া আর উপায় নেই। বংশীদাস বললেন, তাই যদি হয় তবে জীবনে শেষবার গান গাইতে দাও। ডাকাতরা স্বীকার করল। নির্জন বিলের ধারে বংশীদাস মনসার পালা গাইতে লাগলেন, ডাকাতরা শুনতে লাগল। শুনতে শুনতে তাদের মন গলে গেল, মতি গতি ফিরল। শেষে তারা ডাকাতি ছেড়ে বংশীদাসের দলে গান গেয়ে ঘুরে বেড়াত। স্বয়ং কেনারাম খোল বাজাত।

প্রাচীন কাব্যের ছন্দ

এইবার মনে রাখতে হবে সেকালের বইপত্র সব পদ্যে লেখা হত। কেননা, পদ্য তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়, গান করা যায়, শুনতেও ভালো। সাধারণত তিনরকম ছন্দের পদ্যই বেশি চলত। তার মধ্যে পয়ার নামের ছন্দই সবচেয়ে বেশি।

যে-ছন্দের প্রতি পংক্তিতে চোদ্দোটি ক'রে মাত্রা থাকে এবং আট মাত্রার পর একটি যতি বা বিরাম থাকে, তাকে বলে পয়ার।

যেমন—

১ কলির ব্রাহ্মণ আর। বলির ছাগল।
ভালোমন্দ জ্ঞান নাই। প্রশ্রয় পাগল॥

পয়ার ছাড়া অন্য দুটি প্রধান ছন্দের নাম লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদী। যথাক্রমে উদাহরণ দেওয়া গেল—

২. চিনিতে না পারি না করো চাতুরী
বেহুলা বট গো তুমি।
দেহ পরিচয় জুড়াক হৃদয়
তোমার শাশুড়ী আমি॥ (লঘু ত্রিপদী)

৩. কহেন বেহুলা সতী করো বীর অবগতি
মোর সম নাই অভাগিনী।
সায় সদাগর পিতা অমলা আমার মাতা
মোর নাম বেহুলা নাচনী॥ (দীর্ঘ ত্রিপদী)

এই দুটি দৃষ্টান্তের প্রতি লক্ষ্য করলে অনায়াসেই বোঝা যাবে যে, ত্রিপদী ছন্দের প্রতি পংক্তিতে তিনটি করে পদ থাকে; লঘু ত্রিপদীর তিন পদের মাত্রাসংখ্যা যথাক্রমে ছয়, ছয় ও আট এবং দীর্ঘ ত্রিপদীর তিন পদের মাত্রাসংখ্যা আট, আট ও দশ। এই রীতিতে বিচার

করলে বোঝা যাবে, পয়ার ছন্দও আসলে দ্বিপদী ; তার প্রথম পদে আট মাত্রা ও দ্বিতীয় পদে ছয় মাত্রা।

এই তিনরকম ছন্দই প্রাচীন বইয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায়। আরো দু-একরকমের ছন্দ সেকালে ছিল, তাতে রচিত পদ্যের সংখ্যা একেবারেই কম।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের তত্ত্ব

দেবতার উদ্দেশ্যে পদ্যে রচিত বইগুলিকে মঙ্গলকাব্য বলে। বাংলায় নানারকম মঙ্গলকাব্য আছে। তার মধ্যে যেগুলি খুব প্রসিদ্ধ সেগুলির কথাই বলব। এই-সব বইয়ে এক-এক দেবতার মহিমাবর্ণনা আর স্তবগান করা হয়েছে। কিন্তু "এই স্তবগানের লক্ষ্য যে-দেবতা সে নিষ্ঠুর, সে ন্যায়ধর্মের দোহাই মানে না, নিজের পূজা প্রচারের জন্য সে সব অপকর্মই করতে পারে। মানুষ তখন যেসব আকস্মিক বিপৎপাতের দ্বারা বেষ্টিত ছিল, তারই অকারণ হিংস্রতায় দেবতার কল্যাণরূপ তার মনে জাগতে পারে নি। দেবতার স্বভাবের মধ্যে সে যথেচ্ছাচারের প্রবলতা দেখেছে। এই নির্মম দেবতার কাছে নিজেকে একান্ত হীন করেই তবেই পরিত্রাণের পথ কল্পনা করতে পেরেছ। এ তার আনন্দের পূজা নয়, সগৌরব আত্মনিবেদন নয়, ভীরুতার আত্মাবমাননা।"

মানুষ সংসারে বাস করে পরিবারের অনেক লোক নিয়ে। প্রকৃতির নিয়মে তার মধ্যে রোগ শোক দারিদ্র্য প্রভৃতি এসে দেখা দেয়, তাতে হয় সবারই অশান্তি। কাজেই যে-দেবতা পরিবারের মঙ্গল-অমঙ্গল ঘটান, তাঁকে খুশি করতে পারলেই সব দিক দিয়ে ভালো হয়। পারিবারিক এই দেবতাটি হচ্ছেন চণ্ডীদেবী। তিনি মঙ্গল করুন এই ছিল মানুষের মনের কামনা, তাই তাঁকে বলা হয় মঙ্গলচণ্ডী। আসলে

চণ্ডী মানে হচ্ছে অত্যন্ত কোপনস্বভাবা নারী। এই চণ্ডীদেবীর চরিত্র অবলম্বন ক'রে অনেকগুলি কাব্য অনেকে লেখেন। আগেই বলেছি এই জাতীয় কাব্যগুলিতে দেবদেবতার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এতে মাহাত্ম্যের যে-আদর্শ, তাতে আত্মার যথার্থ মহিমা নেই। তখনকার দিনের ঐতিহাসিক অবস্থার প্রভাবেই এরকম হয়েছিল। কেননা, তখন শক্তিশালীর পরিচয়ই ছিল তার যথেচ্ছাচারে। সে-সময়ে প্রায়ই সমাজে যে নীচে আছে, সে হঠাৎ উপরে উঠেছে, উপরের মানুষ নীচে নেমেছে। এই ওঠানামার মধ্যে নানা অন্যায় উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব দেখা যায়। এর থেকে কবি যে-দেবতার রূপ করেছেন, তিনিও ধর্মের রক্ষয়িত্রী নন, তিনি খামখেয়ালী। আজ যার উপরে প্রসন্ন, কাল তার উপরে অকারণে ও অন্যায়রূপে বিমুখ। যে-শিবকে কল্যাণময় ব'লে মনে করা যেত, তাঁর ক্ষমতা নেই। বস্তুত তখনকার শাসনব্যাপারে হীন চক্রান্তকারীদেরই প্রভাব প্রবল হত। দেবকাহিনীতে আগাগোড়া সেই কলঙ্কেরই ছাপ পড়েছে।

এই ভূমিকা থেকেই চণ্ডীকাহিনীর মূল প্রকৃতিটা বোঝা যাবে। এবার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীটা বলা যাক। এই কাহিনীর দুটো ভাগ। প্রথম ভাগে কালকেতু ব্যাধের গল্প, আর দ্বিতীয় ভাগে ধনপতি সদাগরের গল্প। সুতরাং প্রথমেই বলছি কালকেতুর গল্প।

চণ্ডীমঙ্গল—কাহিনী

১. কালকেতুর গল্প

ধর্মকেতু ব্যাধ। তার স্ত্রীর নাম নিদয়া। দুইজনেই চণ্ডীর ভক্ত। চণ্ডীর কৃপায় তাদের একটি ছেলে হল—

উঙা উঙা করে সুত দুইজনে হর্ষ যুত
নিদয়ার সফল মানস,

সুতের কল্যাণ হেতু স্নান করি ধর্মকেতু
দ্বিজে দিল মৃগ গোটা দশ।
অপরূপ ব্যাধসুত দিবসে দিবসে
ষষ্ঠীপূজা একুশে, করিল একমাসে।
দীর্ঘ নিদ্রা যায় শিশু করয়ে দেহালা।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে খেলে ব্যাধবালা॥[১]
গণক আনিয়া নাম থুইল কালকেতু
গণকে দক্ষিণা দিল পরমায়ু হেতু।
একাদশ মাস গেল হইল বৎসর।
বাড়ি বাড়ি ফিরে শিশু নাহি করে ডর॥

কালকেতুর চেহারা ভারি সুন্দর ছিল—

নাক মুখ চক্ষু কান কুঁদে যেন নিরমান
দুই বাহু লোহার সাবল,
রূপগুণ শীল বড়া বাড়ে যেন শালকোঁড়া
জিনি শ্যাম চামর কুন্তল।
বুকে শোভে ব্যাঘ্রনখে অঙ্গে রাঙা ধূলি মাখে
কটিতটে শোভয়ে ত্রিবলী
বিচিত্র কপালতটী গলায় জালের কাঁঠি
করযুগে লোহার শিকলি।
সঙ্গে শিশুগণ ফিরে শশারু তাড়িয়া ধরে
দূরে গেলে ধরায় কুকুরে।
বিহঙ্গ বাঁটুলে বেঁধে লতায় জড়ায়া বাঁধে
স্কন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে।

১ বালক শব্দের প্রাচীন রূপ বালা।

ছেলে ক্রমে ক্রমে বড়ো হতে লাগল, তখন ধর্মকেতু

পুত্রের বিবাহ হেতু করি অভিলাষ,

বলে, কিরাত নগরে কন্যা করহ তল্লাশ—

এতেক বলিল ব্যাধ সোমাই চরণে।

ফুল্লরা সঞ্জয়সুতা পড়ে তার মনে।

সোমাই ওঝা হচ্ছেন ব্যাধদের ঘটকঠাকুর।

অঙ্গীকার করি ওঝা চলিলেন ঝাট,

সবে গেলা নিকেতন সমাপিয়া হাট।

সঞ্জয়কেতুর ঘরে উত্তরিল দ্বিজ,

বন্দিলা সঞ্জয় তার পদসরসিজ।

সঞ্জয়ের মেয়ে ফুল্লরার সঙ্গে কালকেতুর বিয়ে ঠিকঠাক করে সোমাই ওঝা ফিরে এলেন। বর কনের দুই বাড়িতেই বিয়ের আয়োজন চলতে লাগল—

কালকেতুর বিবাহমঙ্গল

চৌদিকে হুলুই ধ্বনি দেয় ব্যাধ সীমন্তিনী[১]

নিদয়ার মানস সফল।

বিয়ে করে কালকেতু ঘরে এল।

অর্জুন সমান বীর কালকেতু মহাবীর

দেখি সুখী হৈল ধর্মকেতু।

নিদয়ার সুখ বড়ো গৃহকর্মে বধূ দড়

কুলযশ রক্ষণের হেতু।

নিদয়া বসিয়া খাটে, মাংস লয়ে গোলাহাটে

অনুদিন বেচয়ে ফুল্লরা।

১ বধূ।

শাশুড়ি যেমতি ভনে সেইমতো বেচে কেনে
শিরে কাঁখে মাংসের পসরা।
তনয়ে বাগুরা জাল সমর্পিয়া বহুকাল
ভুঞ্জে সুখ কিরাতনন্দন।
খাওয়ায় ফুল্লরা বধ্ ক্ষীরখণ্ডদধিমধু
নিদয়ার সফল জীবন।
মুক্তিপথে দিয়া মন শিব চিন্তে অনুক্ষণ
শুনয়ে পুরাণ উপাখ্যান,
জায়া সঙ্গে ধর্ম্মকেতু ভাবিয়া মুক্তির হেতু
বারাণসী করিল প্রস্থান॥

বাপ মা চলে গেলে কালকেতু আর ফুল্লরা ঘরসংসার করতে লাগল। কিন্তু তারা বড়োই গরিব। রোজ আনে রোজ খায়। তার ওপর আবার কালকেতু ছিল খাইয়ে লোক। সে খেতে ব'সে :

মুচড়িয়া দুই গোঁফ বাঁধি লয় ঘাড়ে,
একশ্বাসে দশ হাঁড়ি আমানি উজাড়ে।
চার হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ জাউ,
ছয় হাঁড়ি মসুর সূপ মিশাইয়া লাউ।

এইরকম তার খাওয়া। এক-একদিন সে ফুল্লরার খাবার পর্যন্ত খেয়ে ফেলত। ফুল্লরা থাকত উপোসী। যত দুঃখকষ্টই হ'ক না কেন স্বামী-স্ত্রীতে তাদের মনে মনে খুব মিল ছিল। সেইজন্যে তারা কোনোরূপ দুঃখকষ্টকে গ্রাহ্যই করত না। একদিন :

প্রভাতে পরিয়া ধড়া শরাসনে দিয়া চাড়া
খর ক্ষুর কাছে তিন বাণ।

শিরে বাঁধা জালদড়ি কর্ণে স্ফটিকের কড়ি
মহাবীর করিল পয়ান।

শিকার করতে বনে চলল কালকেতু। বনে ঢুকতেই সোনালী রঙের একটা গোসাপ তার চোখে পড়ল। গোসাপ দেখা অমঙ্গলের লক্ষণ মনে ক'রে—

স্থবর্ণ গোধিকা দেখি মহাবীর হৈল দুখী
অযাত্রিক পাপ দরশনে,
দেখিলু মঙ্গল যত সকলি হৈল হত
দৈবে দুঃখ দেয়, সব শুনে।

সেদিন আর শিকারে কিছু জুটল না।

কংস নদীর জলে বীর করি' স্নান,
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে করে জল পান।
পথে যায় মহাবীর খায় বনফল
মলিন বদনে চিন্তে ঘরের সম্বল।
দুখিনী ফুল্লরা আছে আমার প্রত্যাশে,
কী বলিয়া দাঁড়াইব ফুল্লরার পাশে।
দুঃখ ভাবিয়া বীর চলে পথে পথে
চিন্তায় মলিন চিত্ত ধনুঃশর হাতে।
ধড়ার আঁচলে মোছে নয়নের নীর
কাঞ্চন গোধিকা পুন দেখে মহাবীর।
গোধিকা দেখিয়া বীর করয়ে তর্জন
তোমারে পোড়ায়ে আজি করিব ভক্ষণ।
যাত্রার সময় দেখিয়াছি তোর মুখ।
বনে বনে ভ্রমিয়া পাইলু বড়ো দুখ॥

এমতি যুকতি বীর হৃদয়ে ভাবিয়া
বান্ধিল গোধিকা বীর জাল দড়ি দিয়া।
ধনুকের হুলে হেম গোধিকা টাঙিয়া
ঘরে চলে মহাবীর বিষাদ ভাবিয়া॥
ফুল্লরা নাহিক বাসে আখেটী অন্নের আশে
পড়শীরে জিজ্ঞাসে বারতা
পড়শী বারতা বলে বীর গেল হাটে চলে
দূর হৈতে দেখিল বনিতা।
ফুল্লরা বলেন বাসি মাংস না বিকায়,
আজি মহাবীর, বলো সম্বল উপায়?

কালকেতু উত্তর করল—

গোধিকা বেঁধেছি, বাঁধি দিয়া জালদড়া।
ছাল উতারিয়া প্রিয়া, করো শিকপোড়া।

—তুমি তোমার সখীর কাছ থেকে কিছু খুদ ধার করে আনো, আমি গোলাহাট থেকে চাব কড়ার নুন কিনে আনি।

তখন ফুল্লরা গেল খুদ ধার করতে। কালকেতু গেল নুন আনতে ওই যে গোসাপ, ওটি কিন্তু আসলে গোসাপ নয়। উনি স্বয়ং চণ্ডী। কালকেতুর প্রতি সদয় হয়ে তার ঘরে এসেছেন।

হুংকারে ছিঁড়িয়া দড়ি পড়িয়া পাটের শাড়ি
ষোলো বৎসরের হৈল রামা।
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অকলঙ্ক শশীমুখী
কিবা দিব রূপের উপমা।
সর্বাঙ্গে চন্দন পঙ্ক অঙ্গদ বলয় শঙ্খ[১]
বাহুবিভূষণ সুশোভন

১ বালা ও শাখা।

সকল অঙ্গুলি ভরি মানিকের অঙ্গুরি[১]
দন্তরুচি ভুবনমোহন।
সখীগৃহে খুদসের করিয়া উধার
সত্বরে ফুল্লরা চলে কুঁড়ের দুয়ার।
বাম বাহু স্পন্দে তার স্পন্দে বাম আঁখি
কুঁড়ের দুয়ারে দেখে রামা চন্দ্রমুখী।
প্রণাম করিয়া রামা করয়ে জিজ্ঞাসা,
কে তুমি কাহার জায়া কহ সত্যভাষা,
হাস্যমুখী অভয়ার হৃদয়ে উল্লাস
ফুল্লরারে অভয়া করেন পরিহাস।
শুনগো আমার বাক্য ফুল্লরা সুন্দরী
আইলু বীরের দুঃখ দেখিতে না পারি।
আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে
আনিল তোমার স্বামী বাঁধি নিজগুণে।
তুমি গো ফুল্লরা যদি দেও অনুমতি
এইস্থানে কতদিন করিব বসতি॥

দেবী 'গুণে বাঁধা' মানে ধনুকের গুণে বাঁধার কথা বললেন। কিন্তু ফুল্লরা বুঝলেন উলটো। মনে করলেন মেয়েটি বুঝি তার স্বামীর বীরত্বে রূপে গুণে আকৃষ্ট হয়ে এসেছে। তাই তাঁকে তাড়াবার জন্যে

বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখবাণী,
ভাঙা কুঁড়েঘর তালপাতার ছাউনি।
কত নিবেদিব দুখ কত নিবেদিব দুখ,
দরিদ্র হইল স্বামী, বিধাতা বিমুখ।

[১] আংটি

কিন্তু দুঃখের কথাতে চণ্ডী টললেন না—

বিষাদ ভাবিয়া কাঁদে ফুল্লরা রূপসী
নয়নের লোহেতে মলিন মুখশশী।
কাঁদিতে কাঁদিতে রামা করিল গমন,
গোলাহাটে বীরপাশে দিল দরশন।

কালকেতুকে বলল—

পিঁপীড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে,
কাহার রূপসী কন্যা আনিয়াছ ঘরে।
এ বোল শুনিয়া ক্রোধে বীর বলে বাণী
পরস্ত্রীকে দেখি যেন নিদয়া জননী।
পসরা চুপড়ি পাখি লইল ফুল্লরা,
চলিলেন গোলাহাটের তুলিয়া পসরা।
দূর হৈতে দেখে বীর আপনার বাসে।
তিমির কেটেছে যেন তপন তরাসে।

কালকেতু প্রণাম করে বলছে :

আমি ব্যাধ নীচ জাতি তুমি বামা কুলবতী
পরিচয় মাগে কালকেতু
কিবা দেব দ্বিজকন্যা ত্রিভুবনে এক ধন্যা
ব্যাধের মন্দিরে কিবা হেতু।

এখানে থাকা তোমার উচিত নয়। চলো আমরা দুজনে তোমাকে তোমার বাড়ি রেখে আসি। দেবী এতে কোনো কথাই কইলেন না—

মৌনব্রত করি যদি রহিলা ভবানী,
ঈষৎ কুপিত বীর বলে জোড়পাণি।

বুঝিতে না পারি গো তোমার ব্যবহার,
যে হও সে হও তুমি মোর নমস্কার।
ছাঁড়ো এই স্থান রামা ছাড়ো এই স্থান,
আপনি রাখিলে রহে আপনার মান।
এত বাক্যে যদি চণ্ডী না দিল উত্তর।
ভানু সাক্ষী করি বীর জুড়িলেক শর।
শরাসনে আকর্ণ পূর্ণিত কৈল বাণ,
হাতে শর রহে যেন চিত্রের সমান।
ছাড়িতে চাহয়ে শর নাহি পারে বীর
পুলকে পূর্ণিত তনু চক্ষে বহে নীর।
নিবেদিতে মুখে নাহি নিঃসরে বচন
হতবলবুদ্ধি হৈল আখেটী নন্দন।
নিতে চাহে ফুল্লরা হাতের ধনুঃশর
ছাড়াইতে নারে রামা হইল ফাঁপর।
শরধনু স্তম্ভিত দেখিয়া মহাবীরে
করুণা করিয়া মাতা বলে ধীরে ধীরে
আমি চণ্ডী, আইলাম তোরে দিতে বর
লহ বর কালকেতু ত্যজ ধনুঃশর।

দেবী তাকে মানিকের আংটি আর সাতঘড়া মোহর দিয়ে বললেন—

মানিক অঙ্গুরি সপ্ত নৃপতির ধন
ভাঙাইয়া কাটো গিয়া গুজরাটের বন।
প্রজাগণে বসাইবা দিয়া গোরু ধান
পালিহ সকল প্রজা পুত্রের সমান।
শনি কুজ বারেতে করিহ মোর জাত,
গুজরাট নগরের হইবে তুমি নাথ।

ভাঁড়ুদত্ত বলে একজন দুষ্ট লোকের চরিত্র-বর্ণনা আছে। সে নানা ফন্দি করে কালকেতুকে জব্দ করতে গিয়ে শেষে নিজেই জব্দ হয়ে গিয়েছিল। কালকেতু কলিঙ্গরাজার সঙ্গে যুদ্ধ করল। পরে চণ্ডীর দয়ায়—

গুজরাটে কালকেতু খ্যাত হৈল রাজা,
আর যত ভুঞা[১] রাজা করে তার পূজা।
কোনো রাজা সম নহে করিতে সমর,
পরাজিত হয়ে সবে দেয় রাজকর।
পুষ্পকেতু নামে পুত্র হৈল কতকালে,
গুজরাটে রাজ্যভোগ করে কুতূহলে ॥

২. ধনপতি সদাগরের গল্প

এইবার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় গল্পটি আরম্ভ করা যাক—

উজানী নগর অতিমনোহর
বিক্রমকেশরী রাজা।
করে শিবপূজা উজানীর রাজা
কৃপা কৈল দশভুজা ॥

এই নগরে ধনপতি সদাগর বাস করেন। তাঁর খুব টাকাকড়ি। স্ত্রী ছিল দুটি। বড়োটি লহনা, ছোটোটি খুল্লনা। খুল্লনা চণ্ডীর ভক্ত, চণ্ডীর পূজা করেন। কিন্তু, সদাগর আর লহনা চণ্ডীকে মানেন না। একবার সদাগর সিংহলে চলেছেন বাণিজ্য করতে। খুল্লনা তাঁর পথের মঙ্গল কামনা করে চণ্ডীপূজা করছেন। এমন সময় লহনা গিয়ে সদাগরকে বললেন—

১ অধীন রাজারা।

সদাগর, তোমায় আমায় আছে বিরল কথা।
তোমার মোহিনীবালা শিক্ষা করে ডাইনী কলা
নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা।
হেমঝারি জলগর্ভা উপরে দীঘল দূর্বা
অষ্টশালি তণ্ডুল উপরে।
সিন্দূর চন্দন চুয়া কুঙ্কুম কস্তূরী দিয়া
পূজে প্রতি মঙ্গল বাসরে॥

এই কথা শুনে

সাধু— আগে চলিল লহনা নারীজন
পশ্চাতে চলিল সাধু, বেনের নন্দন।
পূজাগৃহে উপনীত হৈল ধনপতি
জয়[১] দিয়া পূজা করে খুল্লনা যুবতী।
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায়।
ভূমিতে দেবীর ঝারি গড়াগড়ি যায়।
ঘর হৈতে ধনপতি করিল গমন,
উভরায়[২] খুল্লনা সে করেন ক্রন্দন।
পথে যাইতে সদাগরের লাগিল উচোটা,
নেতের আঁচলে লাগে শেয়াকুল কাঁটা।
সবাকারে গাবী ঘর করি সমর্পণ
নৌকায় চড়িল, করি শিবের স্মরণ।

সদাগর বাণিজ্যে চলে গেলেন। তখন লহনা খুল্লনাকে বড়ো কষ্ট দিতে লাগলেন। খুল্লনা আবার তখন গর্ভবতী। চণ্ডীকে স্মরণ ক'রে খুল্লনা সবই সইতে লাগলেন। যথাসময়

১ উলু। ২ উচ্চস্বরে।

প্রসবে খুল্লনা নারী পূর্ণ দশমাসে
হইল তনয়, রূপে দিন পরকাশে।

ছেলেটির নাম শ্রীমন্ত এবং শ্রীপতি রাখা হল।—

দিনে দিনে বাঢ়য়ে শ্রীপতি
কেবল চণ্ডীর ক্রীড়া নাহি রোগ নাহি পীড়া
অন্ধকার হরে দেহজ্যোতি।

এ দিকে ধনপতি সমুদ্রের মাঝে কালীদহ ব'লে একজায়গায়, চণ্ডীর মায়ায় এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখলেন। সমুদ্রের ওপর মস্ত এক পদ্মবন। তার মাঝে এক পরমা সুন্দরী মেয়ে ব'সে। সে একটি হাতি নিয়ে একবার গিলছে আর একবার উগরে ফেলছে। সদাগর তো অবাক।

যথাসময় সিংহলে গিয়ে সেখানকার রাজা শালবানের কাছে সব কথা বললেন—

কালীয়দহের জলে কুমারী কমলদলে
গজ গিলে উগারে অঙ্গনা
অতি কৃশোদরী বালা মাতঙ্গ জিনিয়া লীলা
শশিমুখী খঞ্জনলোচনা॥
সাধুর বচনে শালবান নৃপ হাসে।
রাজার ইঙ্গিতে পাত্র উপহাসে ভাষে॥
সাধু বলে যদি মিথ্যা আমার বচন
লুটিয়া লইবে মোর বহিত্রের ধন॥
দ্বাদশ বৎসর বন্দী থাকি কারাগারে
দেখাইতে নারি যদি কামিনী কুঞ্জরে॥
রাজা বলে যদি সত্য তোমার বচন
অর্ধরাজ্য দিব আর অর্ধসিংহাসন॥

অপরূপ কথা শুনি শালবান নৃপমণি
সাজ বলি দিলেক ঘোষণা।
কমলে কামিনী বৈসে কুঞ্জর উগারি গ্রাসে
শুনি পুরে ধায় সর্বজনা॥

সকলে কালীদহে গেলেন। চণ্ডীর মায়ায় কমলে কামিনী দেখা গেল না। রাজা খুব চটে গেলেন। কালু আর নিশীশ্বর নামক দুজন সেপাইকে হুকুম দিলেন, বাঁধো সদাগরকে—

নৃপতির আজ্ঞা পেয়ে কালুনিশীশ্বরে
ঢেকা মারি সদাগরে লয় কারাগারে।

বারো বছরের মতন সদাগর কারাগারে গেলেন। চণ্ডীর ঘটে লাথি মেরে আসার ফল ফলল।

এ দিকে উজানি নগরে শ্রীমন্ত বড়ো হয়ে উঠছেন। পাঠশালায় যাচ্ছেন—

পড়য়ে শ্রীপতি দত্ত বুঝয়ে শাস্ত্রের তত্ত্ব
রাত্রিদিন করয়ে ভাবনা[১]।
নিবিষ্ট করিয়া মন পড়ে লিখে অনুক্ষণ,
দিনে দিনে বাড়য়ে ধারণা॥

অধ্যাপকের নাম জনার্দন ওঝা। লোকে তাকে দনাই ওঝা বলত। তাঁর সঙ্গে একদিন শ্রীমন্তের তর্ক হল। ওঝা শেষে না পেরে, শ্রীমন্তের বাপ যে সিংহলে বন্দী হয়ে আছেন, এই কথা নিয়ে তাকে খোঁটা দিলেন। শ্রীমন্ত ভয়ানক চটে গেলেন—

কোপে কাঁপে কলেবর চলিলা শ্রীপতি।
ক্রোধে নাহি গুরুপদে করিলা প্রণতি॥

১ মনে মনে অভ্যাস।

বাড়ি গিয়ে মাকে বললেন—

দনাই পণ্ডিত মোরে কহিল নিষ্ঠুর স্বরে
কোন্ কালে মৈল[১] ধনপতি।
মায়ের আয়তি হাতে ভোজন আমিষ ভাতে
মিথ্যা হিন্দু কুলেতে উৎপত্তি॥
হের আইস বড়োমাতা[২] কহি কিছু দুঃখ কথা
দেহ মোরে যত চাহি ধন।
বাপের উদ্দেশ আশে চলিব সিংহল দেশে
সাত ডিঙ্গা করিয়া সাজন॥

অনেক ক'রে বলে-কয়ে শ্রীমন্ত সিংহলে গেলেন, বাপের উদ্দেশ্যে—

আরোপিয়া হেমঘটে ভ্রমরানদীর তটে
চণ্ডিকা পূজেন খুল্লনা।
'আরোপিয়া পদছায়া শ্রীমন্তে করো গো দয়া
পুরাও হে দাসীর বাসনা।'

শ্রীমন্তের মঙ্গল কামনা করে খুল্লনা রোজই চণ্ডীর পুজা করেন। শ্রীমন্তও পথে যেতে তার বাপের মতো কালীদহে কমলে কামিনী দেখতে পেয়ে সিংহলে গিয়ে রাজার কাছে বললেন।— রাজা বিশ্বাস করলেন না। রাজা বললেন—

রাজসভাযোগ্য নহে এই সাধু ভণ্ড।
ধর্মশাস্ত্র বিধানে উচিত হয় দণ্ড॥
সাধু বলে মিথ্যা যদি আমার বচন
লুটিয়া লইও সাত বহিত্রের ধন॥

১ মরে গেছে। ২ লহনা

দক্ষিণ মশানে মোর বধিহ জীবন
অবধানে শুন রাজা মোর নিবেদন ॥
রাজা বলে সত্য যদি তোমার বচন
অর্ধরাজ্য দিব আর অর্ধ সিংহাসন ॥
নিজ কন্যা দিব দান ইথে[১] নাহি আন[২] ।
প্রতিজ্ঞা করিল রাজা সভাবিদ্যমান ॥
রাজা সাধু মিলি কৈল প্রতিজ্ঞা পুরণ ।
মসিপত্রে লিখিত করিল সভাজন ॥

কিন্তু সেখানে গিয়ে শ্রীমন্তও রাজাকে কমলে কামিনী দেখাতে পারলেন না। রাজা শ্রীমন্তের সাত ডিঙা লুটে নিয়ে দক্ষিণ মশানে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। শ্রীমন্ত প্রাণদণ্ডের পূর্বে এক মনে ভক্তিভাবে চণ্ডীর স্তব করতে লাগলেন। চণ্ডীর দয়া হল। তাঁর ভূতপ্রেত এসে রাজার সৈন্যসামন্তের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে তাদের হারিয়ে দিল। চণ্ডী রাজাকে স্বপ্ন দিলেন যে, তার মেয়ে সুশীলাকে শ্রীমন্তের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে নইলে মঙ্গল নেই। রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করে তাই করলেন, শ্রীমন্ত ধনপতিকে কারাগার থেকে উদ্ধার করে আনলেন। শেষে সকলেই আবার চণ্ডীর ইচ্ছায় কমলে কামিনী দেখতে পেলেন। ধনপতি ছেলে বউ নিয়ে দেশে ফিরে এসে ধুমধাম করে চণ্ডীর পূজা করলেন। শিশুকাল থেকে ধনপতি প্রাণপণে যে-দেবতার পূজা করেছেন এই ভাবে তাঁকে ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এই হল চণ্ডীকাব্যের দ্বিতীয় গল্প। আমরা কেবল কাব্যগুলির মূল ঘটনাটাই বলে যাচ্ছি। বইয়ে কিন্তু আরো অনেক কথা আছে।

মানিকদত্ত, মুক্তারাম সেন, ভবানীপ্রসাদ, কমললোচন, মাধবাচার্য, মুকুন্দরাম প্রভৃতি অনেকেই চণ্ডীর কাব্য লিখেছেন। সবচেয়ে মুকুন্দরাম

১ ইহাতে। ২

চক্রবর্তী— কবিকঙ্কণের বইখানিই প্রচলিত বেশি। এখানির বর্ণনা প্রভৃতি খুব সুন্দর।

এই-সব কাব্যকথার কী করে প্রচার হত, সে-কথা একটু বলি। তখনকার যুগে বই-ছাপানোর ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই হাতে লিখে বই নকল করে নিতে হত। বড়ো বড়ো বই নকল করে নেওয়া সোজা কথা নয়। যদিবা নকল করা হল, তা হলে সেই একখানা বই নিয়ে টানাটানি ক'রে অনেকে পড়তে গেলে বইখানিব যা দশা হয় তা তো বোঝাই যায়। দিশি কাগজে অথবা তালপাতায় বই লেখা হত।

এই-সব কাব্যকথা লোকে জানতে পেত গানের মধ্যে দিয়ে। এক-একজন বই আগাগোড়া মুখস্থ করে রাখতেন। তিনি আরো দু-দশ জন লোক জুটিয়ে, বাজনা বাদ্যি নিয়ে একটা গানের দল তৈরি করতেন। যেখানে গান হত সেখানে শতশত স্ত্রী-পুরুষ শুনতে আসত। যিনি প্রধান গায়ক (মূলগায়েন), তিনি এক-এক পংক্তি সুর করে গান করেন। আর তাঁব দলের লোক সেই পংক্তিটা আবার ফিরে গান করে। এমনি করে এক-একটা পালা শেষ হয়। এতে একসঙ্গে শতশত লোক গান শোনে, কখনো আনন্দে হাসে আর কখনো দুঃখে চোখের জল ফেলতে থাকে। এমনি করেই আমাদের দেশে সাধারণ লোকে সেকালে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতিরও কথা জেনেছিল। এই ভাবে আমাদের দেশে সে সময় গণশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের তত্ত্ব

এদেশে ধর্মঠাকুরের পরিচয় প্রথম প্রকাশ করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমশায়। তিনি ধর্মঠাকুরের পূজায় বাংলাদেশে বৌদ্ধ-ধর্মের শেষ পরিণতি অনুমান করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক গবেষণায়

জানা গেছে তা ঠিক নয়। ধর্মঠাকুর প্রধানত বৈদিক সূর্যদেব তবে তাঁর সঙ্গে শিব বিষ্ণু ও আরো অনেক লৌকিক দেবতা উপদেবতা এমন-কি গৌড়ের বাদশা পর্যন্ত মিশে গেছে। ধর্মঠাকুরের প্রতীক হচ্ছে কচ্ছপ। এই কূর্ম মূর্তিতেই তাঁর পূজা হয়।

ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে যত লেখা পাওয়া যায় সেগুলি তিন ভাগে পড়ে, সাংজাত পদ্ধতি, ধর্মপুরাণ আর ধর্মমঙ্গল। সাংজাত পদ্ধতি হচ্ছে ধর্মপূজা বিধানের নিবন্ধ-সংকলন। ধর্মঠাকুরের আদি পুরোহিত রামাই পণ্ডিতের নামে এগুলি চলছে। ধর্মপুরাণে আছে, সৃষ্টিপত্তন, আর ধর্মঠাকুরের মর্ত্য-লোকে পূজাপ্রচার কাহিনী। ধর্মমঙ্গলগুলিই কাব্য। সমস্ত ধর্মমঙ্গলে একই উপাখ্যানের সাহায্যে আদিদেব ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এই উপাখ্যানের মূলে আছে কতকগুলি উপকথা বা গল্প, এবং হয়তো কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার আভাস। কাহিনীটি এইবার বলি—

ধর্মমঙ্গল-কাহিনী

মেদিনীপুর জেলায় ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেন। তিনি গৌড়ের রাজার অধীন। অজয়নদের তীরে ঢেকুর ব'লে একটা জায়গা। সেখানে সোমাই ঘোষের ছেলে ইছাই ঘোষ ক্রমে ক্রমে এমন প্রতাপশালী হয়ে উঠল যে গৌড়ের রাজাকে পর্যন্ত ভয় করত না। ইছাই ঘোষ জাতে গোয়ালা, শ্যামরূপা নামে কালীর ভক্ত, আর কালীর বরে সে অমন দুর্দান্ত হয়ে উঠেছিল!

কর্ণসেন তার সঙ্গে পেরে উঠতেন না। অবশেষে তিনি গৌড়ে গেলেন রাজার সঙ্গে দেখা করতে—

রাজাকে ভেটিতে চলে কর্ণসেন রায়
চারিদিকে নফর চাকর সব যায়।

বার দিয়া বস্যাছে পঞ্চম গৌড়েশ্বর
বার ভুঞা[১] বস্যাছে রাজার বরাবর।
সমুখে পুরাণ পড়ে পাঠক ব্রাহ্মণ
রাজা গৌড়েশ্বর শুনে হৈয়া একমন।
তবে যদি জিজ্ঞাসা করিল গৌড়েশ্বর
কর্ণসেন রায় বলে দরবার ভিতর।
কান্দিতে কান্দিতে বলে মাথায় দিয়া হাত
পউষ মাসে মাথায় পড়িল বজ্রাঘাত।
প্রাণ লয়্যা গৌড়ে এস্যাছি রাতারাতি
ইছাই নিলেক ঘোড়া মালমাত্তা হাতী।
বার ভুঞা রহিল তাহার মুখ চায়্যা
আশ্বাস করিল রাজা হাতে পান দিয়া
বার ভুঞা সংহতি সমরে দিব হানা
বলবন্ত ইছাই জানিব বীরপনা।

তখন গৌড়েশ্বর কর্ণসেনকে ইছাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বললেন। উভয়ের যুদ্ধ হল। সেই যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় ছেলে মারা গেল। তিনি হেরে ফিরে গেলেন।—

বন্ধুঘরে কর্ণসেন দিল দরশন
যুগল নয়ন আঁখি আষাঢ়-শ্রাবণ।
বন্ধুঘরে আছেন বনিতা আর দাসী
রাজ্য গেল বিধাতা করিল বনবাসী।
শীলাবতী রানীকে বলএ বিবরণ
ছয় বেটা মৈল তোর ঢেকুরের রণ।

১ বারোজন অধীন রাজা।

সাত পুরুষের ভূম এতদিনে গেল
বনিতা সমুখে শোকে কান্দিতে লাগিল।
ছয় বধূ অনুমৃতা হৈল জরাতুর
পুত্রশোকে মৈল রানী খাইয়া মাহুর[১]।
চেয়্যা দেখে দশদিক সব হৈল শূন
ধনকড়ি লুটিল ভাণ্ডার হৈল উন[২]।

তখন রাজা—

বৃন্দাবনে তপস্যা করিতে চলে ধাই
মনেতে পড়িল তার গৌড়েশ্বর ভাই।
বাঘছাল পরিধান তখনি পরিল
পুনর্বার রাজার দরবারে দেখা দিল।
রাজার সমুখে আসি কর্ণসেন কান্দে
বারভুঞাগণ সব এক নাঞী বান্ধে।

রাজার কাছে বিস্তর বিলাপ করে—

বড় দুখ মরমে রাখাল ভূম নিল
কর্ণসেন পুত্রশোকে কান্দিতে লাগিল।
[উদাসীন হয়ে যাই তুমি আজ্ঞা দিলে
রাজা বলে— কর্ণসেন, অবোধ হইলে।
বৃদ্ধক দশাতে কোথা হবে দেশান্তরী
ঘরে বস্যা কৃষ্ণ ভজ মন দৃঢ় করি'।]
দরবার ভাঙ্গিয়া রায় করিল গমন
বাসাকে বিদায় হৈল বারভুঞাগণ।
অন্তর[৩] মহল বৈ দিল দরশন
ভানুমতী রানী বস্যা অপূর্ব আসন।

১ বিষ। ২ শূন্য। ৩ অন্দর।

ছোট বনি[১] সমুখে বস্যাছে রঙ্গাবতী
পট্টবাস আপুনি পরাইল ভানুমতী।
বিরলে বসিয়া বলে নৃপচূড়ামণি
কর্ণসেনে বিভা দিব তোমার ভগিনী।

এই রঙ্গাবতীকে দেখেই রাজা মনে করলেন, আমার জন্যেই যুদ্ধ করে কর্ণসেনের অমন দশা হয়েছে; সুতরাং এর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কর্ণসেনকে আবার সংসারী করব।

বিরলে বসিয়া বলে নৃপচূড়ামণি
কর্ণসেনে বিভা দিব তোমার ভগিনী।

কর্ণসেন তখন বুড়ো থুড়থুড়ে। রঙ্গাবতীর ভাই মহামদ চান তাকে ভালো ঘরে ভালো বরে দিতে। মহামদ আবার গৌড়েশ্বরের সেনাপতি। গৌড়েশ্বর কৌশলে মহামদকে অন্য দেশে পাঠিয়ে, রঙ্গাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিয়ে দিয়ে দিলেন। রঙ্গাবতীর মা বাবা অবশ্য জানলেন। প্রবল প্রতাপ জামাইকে কিছু বলতে পারলেন না। মহামদ বিদেশ থেকে ফিরে এলেন, তাঁর মা তাকে সমস্ত খবর দিলেন।

মঞ্জরা[২] বলেন বাপু কি বলিব তোরে
রঙ্গাবতী বিভা দিনু কর্ণসেন-করে।
লুকাইয়া বিভা দিনু রায় গৌড়েশ্বরে
তোর বনি রঙ্গাবতী গৌড় নগরে।

এত শুনি জলে পাত্র অগ্নির সমান
বুড়া বরে রঙ্গাবতী রাজা দিল দান।
বড় দুঃখ দিল রাজা কর্ণসেন বুড়া
মোর বনি বিভা করে হয়ে আঁটকুড়া

১ ভগিনী। ২ রঙ্গার মা।

বনি বল্যা এত দিনে দিনু বিসর্জন
বংশ হইলে না রাখিব এই মোর পণ।
মথুরা নগরে ছিল মহারাজা কংস
বিনাশ করিল যেন দৈবকীর বংশ।
রঞ্জাবতী বনি মোর জীয়ন্তে মরিল
বনি প্রতি হিয়া যেন পাষাণে বান্ধিল।

মহামদ রঞ্জাবতীকে স্বামীর ঘর করতে মানা করলেন। রঞ্জাবতী সে-কথা শুনলেন না। তাই রঞ্জাবতীরও ওপরে ভারি চটে গেলেন।

রামাই পণ্ডিতের উপদেশে রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের পূজা ক'রে এক মহাবীর পুত্র পেলেন। তার নাম রাখলেন লাউসেন।

মহামদ লাউসেনের নানারকম অনিষ্ট করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ধর্মের কৃপায় তাঁর কিছুই করতে পারলেন না। অবশেষে গৌড়েশ্বরকে কুমন্ত্রণা দিলেন, তিনি ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাউসেনকে আদেশ করলেন। লাউসেনের সেনাপতি কালুডোম। তার সহায়তায় ভীষণ যুদ্ধ হল। কালুডোম যুদ্ধে মরে গিয়েও ধর্মঠাকুরের বরে বেঁচে উঠল—

[গোয়ালা হানিল চোট, সামালিয়া বীর
অমনি উলটি হানে ইছাইয়ের শির।]

লাউসেন ইছাই ঘোষের মাথা কেটে ফেললেন।—

[নির্ভয় হৈল পুরী জয় হৈল রণ।
পরম পিরীতি পাইল প্রভু নিরঞ্জন ॥]

কেউ জয় করতে পারে নি ব'লে যে ঢেকুরের নাম ছিল অজয়, আজ লাউসেন তা জয় করে দেশে ফিরলেন। ধর্মের মহিমায় চার দিকে জয় জয় রব উঠল।

মুণ্ডে আর হাড়ে তুমি কেনে পৈর মালা,
ঝলমল করে গায়ে ভস্ম ঝুলিছালা।
মহাদেবে বলে গৌরী কহিয়াছ ভার,
তোমার অস্থির মালা গলাতে আমার।
সপ্তবার মর তুমি হও সপ্তবার,
একবার মর তুমি একখানি হাড।

গৌরী। তুমি কেনে থাক গোসাই আমি কেনে মরি,
সেই তত্ত্ব কহ গোসাই যুগে যুগে তরি।

এই তত্ত্বের নাম মহাজ্ঞান। এই মহাজ্ঞান জানলে জন্মমৃত্যুর সমস্ত রহস্য জানা যায়। এমন-কি, মরাকেও বাঁচানো যায়।

গৌরীর বচন শুনি কএ মহেশ্বর,
তুমি আমি চল যাই সমুদ্র ভিতর।
এ বলিয়া দুইজন চলিল সত্বর,
সেই সাগরেতে আছে টঙ্গি মনোহর।
মৎস্যরূপ ধরি তবে মীন মোচন্দর[১],
টঙ্গির নামতে রয় বোগাল[২] সুন্দর।
মহাদেব বলে দেবী শুন দিয়া মনে,
টঙ্গিত পরম তত্ত্ব কহি তোমা স্থানে।

নির্জনে শিব পার্বতীকে এই পরম তত্ত্ব শোনাচ্ছেন। পার্বতী কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লেন। সেইখানে জলের নীচে মীননাথ বোয়ালমাছ রূপে আড়ি পেতে ছিলেন। তিনি সব মহাজ্ঞান শিখে ফেললেন।

দেবীর বচনে শিবে চিন্তিলেক মনে,
কহিতে বচন মোহি হুংকারিল কোনে।

১ মৎস্যেন্দ্র। ২ মাছ।

বিমর্সিয়া চাএ শিব করিয়া ধেয়ান,
টঙ্গির নীচেতে দেখে মীন পরিমাণ।
চিন্তিয়া জানিল শিব স্বরূপ বচন,
শাপ দিল এক কালে হৌক বিস্মরণ।

নির্জনে স্ত্রীর সঙ্গে যে-আলাপ শিব করছেন, যোগী হয়ে মীননাথ তা চুরি করে শুনলেন। তাই শিব শাপ দিলেন মীননাথের সন্ন্যাসধর্ম যাবে, তিনি গৃহস্থ হয়ে স্ত্রীপুত্র নিয়ে সংসার করবেন।

যাই হ'ক মীননাথ তো সেখান থেকে বেরিয়ে দেশে দেশে ধর্মপ্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর মহা প্রভাব কিন্তু পার্বতী শিবকে বললেন—

আজ্ঞা যদি কর তুমি স্বরূপ বচন,
কটাক্ষে হরিতে পারি সিধা[১] সবের মন।
দেবীর বচনে শিব ধ্যান আরম্ভিল,
একে একে যত সিধা ডাকিয়া আনিল।

দেবীর মায়ায় মীননাথ আর তাঁর সন্ন্যাসীর দল সংসারী হয়ে গেলেন। মীননাথ গেলেন দক্ষিণ দেশে কদলীপত্তনে। সেখানে তিনি রাজা হলেন। রানী চাকরানী লোকলস্কর নিয়ে খুব ধুম করে রাজত্ব করতে লাগলেন। মহাজ্ঞান ভুলে গেলেন। গোর্খনাথকে দেবী ভোলাতে অনেক চেষ্টা করলেন, পারলেন না।

হেনকালে ভবানী মনেতে ভাবি কাজ,
গোর্খেরে দিবারে মুই না পারিলাম লাজ।

কাজেই গোর্খনাথই জয়লাভ করলেন। কদলীপত্তনের রানীরা টের পেলেন মীননাথ একজন যোগী। তাই যোগী দেখে যদি ইনি উদাসীন

১ সিদ্ধপুরুষ।

হয়ে রাজত্ব ছেড়ে চলে যান, এই ভয়ে দেশে যোগীদের ঢোকা নিষেধ করে দিলেন।

যে ধরি দেশেতে রাজা মীন অধিকারী,
সেই ধরি না দেখিএ যোগী দেশান্তরী।
পরদেশী যোগী পাইলে মীনে নি জাএ ধরি,
দক্ষিণ মশানে নিয়া তারে ফালাএ মারি।

কাজেই কোনো যোগী সন্ন্যাসী আর সেখানে ঢুকতে সাহস করত না। এদিকে গোর্খনাথ তাঁর গুরুকে খুঁজতে খুঁজতে টের পেলেন, গুরু কদলীপত্তনে রাজত্ব করছেন। সেখানে যোগীর ঢোকা বিপদজনক। অথচ গুরুর সঙ্গে তাঁর দেখা করা চাই। কেননা, গুরু মহাজ্ঞান ভুলে সংসারী হয়ে পড়েছেন, তাঁকে উদ্ধার করা চাই। গোর্খনাথ মনে করলেন তিনি মেয়ে সেজে কদলীপত্তনে ঢুকবেন। গোর্খনাথের চেহারা অতি সুন্দর ছিল। তার উপর তিনি নাচতে গাইতে অদ্বিতীয় ওস্তাদ ছিলেন। গোর্খনাথ সাজসজ্জা জোগাড় করলেন—

অলংকার পাইয়া নাথ করিল ভূষণ,
একে একে পরিলেক যথ আভরণ।
গলাতে দিলেন নাথ সাতছড়ি হার,
করেতে কঙ্কণ দিল অতি শোভাকর।
কপালে তিলক দিল নয়ানে কাজল,
করণেতে দিল নাথ সুবর্ণ কুণ্ডল।
পায়েতে নূপুর দিল কনক উঝটি,
গায়েত কাঞ্চলি দিল কোমরে কাছটী।
এমত করিল সাজ ভুবন মোহন,
আছৌক আনের কাজ টলে মুনির মন।

সুবর্ণের সাজ করি পরিধান ধোপ,
আছোক মনুষ্যের মন দেবে করে লোপ।
লঙ্গ মহালঙ্গ দুই সংহতি করিয়া,
মীনের সভাতে গোর্খ যায়ন্ত চলিয়া।

রাজবাড়িতে নাচগানের আয়োজন হল। রাজা রানী পাত্র মিত্র সবাই শুনতে বসলেন—

প্রণাম করিয়া নাথ মাদলে দিল হাত,
লোমাঞ্চিত হইয়া বৈসে রাজা মীননাথ।
ঢিম ঢিম করিয়া মাদলে দিল সান,[১]
অমৃত নিসরিল যেন কর্ণে কৈল পান।
নাচন্ত যে গোর্খনাথ মাদলে করি ভর,
মাটিতে না লাগে পদ আলগ উপর।
নাচন্ত যে গোর্খনাথ ঘাগরের রোলে,
কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলেতে বোলে।
তাহার পশ্চাতে বাম মাদলে দিল ঘাত,
সবপুরী মোহিত করিল গোর্খনাথ।
লঙ্গ মহালঙ্গ দুই দৃতে বাহে তাল,
ঝমকে ঝমকে শব্দ উঠে অতি ভাল।

'কায়া সাধ' মানে দেহ দিয়ে ধর্ম সাধনা করো। এই কথাটাই মাদলের বোলের সঙ্গে গোর্খনাথ তাঁর গুরুকে জানাচ্ছেন।

গোর্খনাথ নাট করে নূপুরে রুনুঝুনু,
দেখি শুনি মীননাথ পুলকিত তনু।

পরে গোর্খনাথ নির্জনে মীননাথের সঙ্গে আলাপ করলে মীননাথ

১ স্বন শব্দ।

তাঁকে চিনতে পারলেন। নিজে সংসার ভোগ করার জন্য লজ্জিত হলেন, কিন্তু রাজত্ব ত্যাগ করতে সাহস করলেন না। তখন গোর্খনাথ নানারূপ উপদেশ দিতে লাগলেন—

গোর্খের বচন শুনি ঈশ্বর মীনাই,
পুনরপি গোর্খস্থানে কইল বোঝাই।
ভালো কহ অএ পুত্র যতি গোরখাই,
উলটি সাধিতে যোগ গায়ে বল নাই।

ক্রমাগত উপদেশ দিয়ে গোরক্ষনাথ গুরুর মন ফেরালেন। শিবের শাপও শেষ হল। মহাজ্ঞান আবার ফিরে পেলেন—

স্বপ্ন হতে মীন যেন উঠিল জাগিআ,
আসনে বসিল মীন জ্ঞান আকলিয়া[১]।

মীননাথ রাজত্ব ত্যাগ করে চলে গেলেন। এই বিষয় অবলম্বন করে যে-সব বই লেখা হয়েছে, তার কোনোটার নাম গোর্খবিজয় আর কোনোটার নাম মীনচেতন।

২. ময়নামতীর গান

এই ধর্মসম্প্রদায়ের আর-একটা গল্প নিয়ে কতকগুলি বই লেখা হয়। সেগুলি, গোপীচাঁদের গান, গোবিন্দচন্দ্রের গান অথবা ময়নামতীর গান নামে পরিচিত।

বাংলার রাজা গোপীচাঁদের চরিত্র নিয়ে কাব্যগুলি রচিত। এই গল্পটি এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, মরাঠী, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষাতেও এর অনুবাদ করা হয়। এখনো সে-সব দেশে গোপীচাঁদের বিষয় থিএটারে

১ আঁকড়ে।

দেখানো হয়ে থাকে। অথচ আমরা আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষের কথা ভুলে বসে আছি।

বাংলাদেশে মেহেরকুলের রাজা তিলকচন্দ্র। তার মেয়ে ময়নামতী। একবার গুরু গোর্খনাথ তাঁদের বাড়ি আসেন। ময়নামতীর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মহাজ্ঞান দেন এবং নিজের শিষ্যা করেন। তাই ছোটোবেলা থেকেই তিনি যোগসিদ্ধা আর জ্ঞানবতী ছিলেন।

বাংলার রাজা মানিকচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল। রাজার আরো অনেক রানী ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ময়নামতীর বনত না ব'লে রাজা তাঁকে ফেরুসা নামে এক গ্রামে বসবাস করতে পাঠালেন।

রাজা মৃত্যুর সময় ময়নাকে দেখতে চাইলেন। ময়না এলেন। রাজাকে মহাজ্ঞানের মন্ত্র দিতে চাইলেন, এই মন্ত্র নিলে তার মৃত্যু হবে না।' রাজা মানিকচাঁদ বললেন—

ঘরের রমণী স্থানে যে জ্ঞান সাধিমু
গুরু বলি কোন্ মতে পদধূলি লৈমু।
তোমার যে এহি জ্ঞান মোর কার্য নাহি
সব জ্ঞান কহি দিয়ো গুপিচাঁদের ঠাঞি।

গোপীচাঁদ ময়নামতীর ছেলে। গোর্খনাথের বরে তিনি তাঁকে পেয়েছেন। মানিকচাঁদ স্ত্রীকে গুরু ব'লে স্বীকার করে মন্ত্র নিতে চাইলেন না। অবশেষে তিনি মারা গেলেন। গোপীচাঁদ এখন রাজা হবেন। কিন্তু তাঁর জন্মের সময়—

পণ্ডিত পাঠক যত মহন্ত গোঁসাই
গ'নে দেখে আঠারো বৎসর বালকের পরমাই।
আঠারো বৎসর প্রমাই উনিশে মরিবেক,
হাড়িফার চরণ সেবি অমর হইবেক।

এই হাড়িফা ময়নামতীর গুরুভাই। ফেরুসাতে বাসের সময় এঁরা পরস্পর অনেক সময় ধর্মচর্চা করতেন। ময়নামতীর মনে সুখ নেই। এ দিকে গোপীচাঁদ রাজা পেলেন—

তার পর করিল বিভা হরিশ্চন্দ্র কন্যা
পৃথিবী উপরে সেই গুণে বড়ো ধন্যা।
হরিশ্চন্দ্রের কন্যা অদুনা তার নাম,
শশধর জিনিয়া মুখের অনুপাম।
কন্যার পাত্র দেখে রাজার কৌতুক,
ছোটো কন্যা পদুনা ছিল দিলেন যৌতুক।

ছেলে সংসারে থাকলে উনিশ বছরে মারা যাবে। যদি বারো বছরের মতো সন্ন্যাসী হয়ে যায় তবে আর মরবে না। এ কথা ময়নামতী জানেন। তাই গোপীচাঁদকে বার বার সংসার ত্যাগ করবার জন্য উত্তেজিত করতে লাগলেন। গোপীচাঁদ সম্মত হন তো রানীরা হন না। অবশেষে আসল কথা জানতে পেরে

মায়ের চরণে রাজা প্রণাম করিয়া
গুরু সঙ্গে যায় রাজা বিদায় হৈয়া।
সন্ন্যাসী হইয়া রাজা গুরু সঙ্গে যায়
একশ বুড়ি কড়ি রাজার ঝুলিতে ছায়।

হাড়িফা গোপীচাঁদের ধৈর্য পরীক্ষা করবার জন্য তাঁকে নানারকম কষ্ট দিলেন, তিনি তাতে অটল রইলেন। বারো বছর বাদে গোপীচাঁদ নিজের বাড়িতে ফিরে এসে বাড়ির ভেতর ঢুকতে গেলেন। তখন রানীরা চিনতে না পেরে কুকুর লেলিয়ে দিলেন। কুকুর কিন্তু চিনতে পেরে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে লেজ নাড়তে লাগল। তখন রানীরাও চিনলেন। মাথার জটা মুড়িয়ে গোপীচাঁদ রাজত্ব করতে বসলেন।

দেশে আনন্দের হাট বসে গেল। গোপীচাঁদের এই সন্ন্যাসের কথা লোকে রামবনবাসের মতো চোখের জল ফেলতে ফেলতে শুনত।

ফয়জুল্লা, শ্যামদাস সেন, ভীমসেন দাস রায়ের গোর্খবিজয় এবং স্কুর মামুদ, ভবানীদাস প্রভৃতি কবিদের লেখা ময়নামতীর গান বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের মধ্যে যেগুলি প্রধান সেগুলির কথা একে একে বলা গেল। দেখা গেল যে প্রত্যেক গল্পই ধর্মের বিষয় অবলম্বন করে লেখা। অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ গল্প আরো অনেক আছে। সেগুলিও এইভাবে কোনো না কোনো লোককে জড়িয়ে ধর্মের বা দেবতার মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ।

আমাদের দেশের হিন্দুরা সাধারণত শক্তি (দুর্গা), সূর্য, গণেশ, শিব আর বিষ্ণুর মধ্যে কোনো না কোনো দেবতার ভক্ত। এই-সব ভক্তেরা নিজের নিজের উপাস্য দেবতার কথা লিখেছেন। দুর্গার বিষয়ে দু-একখানা বইয়ের কথা আগেই বলেছি। সূর্যের কথা নিয়ে সূর্যের গান, গণেশের কথা নিয়ে গণেশমঙ্গল (বাংলায় গণেশের সম্বন্ধে বই খুব কম), শিবের বিষয় নিয়ে শিবের গান বা শিবায়ন আর বিষ্ণুর সম্বন্ধেও কৃষ্ণমঙ্গল, কৃষ্ণবিলাস প্রভৃতি বই রচিত হয়েছিল।

দক্ষিণ বঙ্গে অর্থাৎ সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘের ভয় খুব প্রবল। তাই সে-অঞ্চলে দক্ষিণরায় নামে এক বাঘের দেবতাও কল্পিত হয়েছে। এই দক্ষিণরায়ের কাহিনী নিয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম রায়মঙ্গল— সে কথা আগেই বলেছি।

যে-সব বইয়ের কথা আগে বলা হল সে-সব বইয়ে তখনকার রীতি-নীতি সাজসজ্জা খাওয়াপরা প্রভৃতি নানা বিষয়ের খবর পাওয়া যায়। প্রাচীন সব বইয়ে এইরকম বর্ণনা আছে। খাওয়া আর পরা এ দুটো মানব-সভ্যতায় সবচেয়ে দরকারি। তার কিছু এখানে উল্লেখ করলে নেহাত

রসভঙ্গ হবে না। সেযুগে মেয়েদের ভালো রান্নাকরার খ্যাতিতে একটা গৌরব ও আত্মপ্রসাদ ছিল যেমন এযুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভে হয়ে থাকে। লক্ষপতি ধনীঘরের গৃহিনীরাও রাঁধতে লজ্জা বোধ করতেন না, তাঁরা স্নান করে "শুচিবাস" পরে একটু সেজেগুজেই হেঁসেলে ঢুকতেন, আর রাঁধতেন কী—

বাস্তুকশাক পাক করি বিবিধ প্রকার
পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মানকচু আর
চৈমরিচ স্থক্তা দিয়া আর ফল ফুলে
অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে।
নারিকেলশস্য ছানা শর্করা মধুর
মোচাঘণ্ট দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড প্রচুর।
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট
ক্ষীরপুলি নারিকেলপুলি পুলি পিঠা ইষ্ট··

আর আচার মোরব্বা প্রভৃতি বেশিদিন ট্যাকসই খাবার হচ্ছে—

আমকাসন্দি জামকাসন্দি ঝালকাসন্দি নাম
নেবু আদা আম্রকোলি বিবিধ সন্ধান।
ধনিয়া মহুরি তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া
নাড়ু বাঁধিয়াছে চিনির পাক করিয়া।
আমসি আম্রখণ্ড তৈলাম্র আমতা
যত্ন করি গুণ্ডি ভরি পুরানো স্থকুতা।
কর্পূর মরীচ এলাচ লবঙ্গ রসবাস
চূর্ণ দিয়া লাড়ু কৈল পরম স্থবাস।
সান্দি ধান্যের খই ঘৃতেতে ভাজিয়া
চিনিপাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া।···

আমিষ রান্নার বেলায়—

বড় বড় কৈমৎস্য ঘনঘন আঞ্জি
জিরা লঙ্গ মাখিয়া তুলিল তৈলে ভাজি।
কাতলের কোল ভাজে মাগুরের চাকি।
চিতলের কোল ভাজে রসবাস মাখি।
বেত আগ বালিয়া[১] চুঁচুরা মৎস্য দিয়া।
সুকুত ব্যঞ্জন রাঁন্ধে আদা বাটিয়া।…

আবার

কাউঠার[২] মাংস রাঁন্ধে তৈল ডিম্ব দিয়া
তলিত[৩] করিয়া তুলে ঘৃতেতে ছাঁকিয়া
কৈতরের বাচ্চা ভাজে কাউঠার হাতা
ভাজিছে খাসীর তৈলে দিয়া তেজপাতা
মাংসেতে দিবার জন্য ভাজে নারিকেল
ছাল খসাইয়া রাঁন্ধে বুড়া খাসীর তেল।
ছাগমাংস কলার পাতে অতি অনুপাম।
ডুম ডুম করিয়া রাঁন্ধে গাড়রের[৪] চাম।…

খাবার জিনিসের এত রকম ফর্দ আছে পড়তে পড়তে অনেকেরই হয়তো খিদে পেয়ে যায়।

পরার বেলায় পুরুষরা পাগড়ি, কুণ্ডল, আঙিয়া (জামা), কাপড়, জুতা পরে বেরুতেন। মেয়েরা মেঘডম্বুরী গঙ্গাজলী অগ্নিপাটের শাড়ি পরে, সিঁথি কুণ্ডল, নথ নোলক, বেশর, হার, বাজু পঁইছা বালা চন্দ্রহার গোট বাঁকমল পাঁয়জোর নূপুর চুটকী প্রভৃতি নানাবিধ অলংকারে নিজেদের শোভা বাড়িয়ে তুলতেন।

অন্যান্য বিষয়েরও যথেষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। সবই প্রায় একরকম তবে অনেক কিছু তার ভেতর আছে যা এসময়ে লোপ পেয়ে গেছে।

১ বেলেমাছ। ২ কচ্ছপ। ৩ ভাজা। ৪ ভেড়ার।

লোকসাহিত্য

বাংলায় এক দিকে যেমন বড়ো বড়ো কাব্য রচিত হয়েছে, তেমনি অপর দিকে ছোটো ছোটো বিষয় নিয়েও প্রচুর সাহিত্য রচিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে ছড়া খুব প্রাচীন। খেলার ছড়া, ছেলে-ভুলোনো ছড়া, উপদেশের জন্য ছড়া প্রভৃতি নানা বিষয়ের ছড়া আছে। এমন অনেক ছড়া আছে যার রচনার সময় ঠিক করা কঠিন। সেগুলি অতি পুরোনো।

১. খেলার ছড়া

খেলা করা প্রাণীর ধর্ম। পশু পক্ষী থেকে মানুষ পর্যন্ত সকলেই আনন্দের সঙ্গে খেলা করে। এই খেলার আনন্দটির সঙ্গে পদ্য যোগ করে সেটাকে আরো বাড়িয়ে তোলবার জন্য বোধ হয় খেলার ছড়া তৈরি। সবাই কোনো না কোনো রকম খেলার ছড়া জানে। কয়েকটির দু-এক লাইন করে নমুনা দিচ্ছি :

ঘুঘু সই পুত কই কী ছেলে বেটা ছেলে।···
ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি চামের কৌটো মজুমদার
ধেয়ে এল দামোদর।···
আক্কা বাক্কা তিন তলাক্কা
লোয়া লাঠি চন্নন কাঠি···
উলুকুটু ঢুলুকুটু নলের বাঁশি
নল ভেঙেছে একাদশী।
তালগাছ কাটন বোসের বাটন হেন গৌরি ঝি
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কী।

এই ছড়াগুলির মধ্যে হয়তো কোনো অর্থের সংগতি নেই। তা না থাকলেও এর মধ্যে একটা ঝংকার আছে, যাতে মন খুব মাতিয়ে

দেয়। এইজন্তেই কতকাল থেকে সমান ভাবে এগুলি আমাদের মন দখল করে আছে।

২. ছেলে-ভুলানো ছড়া

ছেলে-ভুলানো ছড়াগুলিও অতি চমৎকার। ছোটো ছোটো ছেলেরা শুনে ভারী খুশি হয়।

খোকাকে ঘুম পাড়াবার জন্য মা খোকার গায়ে চাপড় দিতে দিতে সুর করে ছড়া বলছেন, আর খোকা আধবোঁজা চোখে শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ছে—

ঘুমপাড়ানী মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো,
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো।…

কিংবা

খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে
টিয়াপাখিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।

শুধু ঘুমানো নয় খোকাখুকুর যত কিছু কাজ সবগুলির বিষয়ে এই ছড়া আছে, এমন-কি, তাদের কাল্পনিক বিয়ের ওপর পর্যন্ত। এ ছড়াগুলিও অতি প্রাচীন। কার রচিত তা কেউ জানে না—

খোকন এল বেড়িয়ে দুধ দাও গো জুড়িয়ে॥

হাঁটি হাঁটি পা পা দুধি ভাতি খা' খা'
জাদু হাঁটে রাঙা পা॥

খোকা গেল মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে মাছ নিয়ে গেল চিলে॥

বাপ ধন ধন ধনা পুঁথি হাতে পড়বে মানিক
দুলবে কানে সোনা॥

খোকা যাবে শ্বশুরবাড়ি
সঙ্গে যাবে কে
বাড়িতে আছে কুনো-বিড়াল
কোমর বেঁধেছে ॥

খুকুমণির বিয়ে দেব
হট্টমালার দেশে
তারা গাই বলদে চষে ॥

উলু উলু মাদারের ফুল বর আসছে কত দূর
বর আসছে বামুনপাড়া বড়ো বৌ গো রান্না চড়া ॥

খুকুন বালা টাকার ছালা
মটকি ভরা ঘি
খুকুমণির বিয়ে হল না
ছি ছি ছি ॥

খুকুমণি দুধের ফেনি কৌ গাছের মৌ
সব ছেলেদের বলব খুকুন হাঁড়ি-খাগীর বৌ ॥

দোল দোল দুলুনি রাঙা মাথায় চিরুনি
বর আসবে যখনি নিয়ে যাবে তখনি ॥

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে
সুজ্জি গেছে পাটে
খুকু গেছে জল আনতে
পদ্মদিঘির ঘাটে ॥

এইরকম শত শত ছড়া আমাদের দেশে মেয়েদের মুখে মুখে রয়েছে। উদ্ধৃত ছড়ার অংশগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, কতরকমে এগুলিতে

খোকাখুকুর কথা বলা হয়েছে। এগুলি আমাদের মা-বোনের অন্তরের কথা। তাই এগুলি চমৎকার আর এমন চিরনূতন।

৩. বিবিধ

আরো একরকম ছড়া আছে সেগুলিতে আমাদেরই ঘরোয়া কথা শিব দুর্গা বা গোপালের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যায়, মায়ের মনে বড়ো কষ্ট হয়। এতকাল ধরে যাকে বুকে পিঠে করে মানুষ করা হল সেই মেয়ে চিরকালের মতো অপরের হয়ে গেল। মায়ের মনের সেই মেয়ের বিয়োগ-ব্যথাই আগমনী আর বিজয়ার ছড়ারূপে ব্যক্ত।

ছেলে বা স্বামী বিদেশে গেলে মা বা স্ত্রীর মনে যে কষ্ট হয়, সেই কষ্টই ব্যক্ত হয়েছে যশোদার আর রাধিকার মুখ দিয়ে।

কখনো কখনো আবার সাময়িক ঘটনা নিয়েও ছড়া তৈরি হয়েছে। যেমন দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প, হাতিধরা, সাঁওতালবিদ্রোহ অথবা কোনো ব্যক্তিবিশেষের ভালো বা মন্দ কাজের সমালোচনা প্রভৃতি।

৪. ডাক ও খনার বচন

উপদেশ বা কাজের বিষয় নিয়ে যে-সব ছড়া সেগুলিকে বচন বলে। যেমন— ডাকের বচন, খনার বচন, প্রবাদবচন ইত্যাদি। ডাকের বচন আর খনার বচনে অনেক কাজের কথা আছে। এগুলিও খুব পুরোনো। নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতার পরিচয়ও এতে পাওয়া যায়। যথা—

উপদেশ

যথা ধর্ম তথা জয়
পাপ করলে ভুগতে হয়।

লিখলে পড়লে দুধি ভাতি
না পড়লে ঠ্যাঙার গুঁতি।
লেখাপড়া করে যে
গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে। ইত্যাদি

ধর্মের লক্ষণ

ধর্ম করিতে যে জন জানি
পুখর দিয়া রাখিয় পানি
অশ্বত্থ রোপে বড়ো কর্ম
মণ্ডপ দেয় অশেষ ধর্ম
অন্ন বিনা নাহি দান
ইহাপর ধর্ম নাই আন॥

রান্নার কথা

নিম পাতা কাসন্দির ঝোল
তেলের উপর দিয়া তোল্॥
মদগুর মৎস্য দা দিয়া কুটিয়া
হিঙ্ আদা লবণ দিয়া
তেল হলদি তাহাতে দিব
বলে ডাক ব্যঞ্জন খাব॥

ভালো গৃহিণী

মিঠা রাঁধে সরুয়া কাটে
সে-গৃহিণীতে ঘর না টুটে॥

মন্দ গৃহিণী

যে গৃহিণী আয় ব্যয় না বুঝে
বোল বলিতে উত্তর যুঝে

ভালো বলিতে রোষ করে
তাহার স্বামী কেন থাকে ঘরে ॥

এইরকম ডাকের বচনে ঘরোয়া কথা পাওয়া যায়। খনার বচন বেশির ভাগ চাষবাস সম্বন্ধে। যেমন—

শোন্ বাপু চাষার বেটা
বাঁশ ঝাড়ে দিয়ো ধানের চিটা
চিটা দিলে বাঁশের গোড়ে
দুই কুঁড়া ভুঁই বেড়বে ঝাড়ে ॥

যদি বর্ষে আগনে রাজা যান মাগনে ॥

যদি বর্ষে মাঘের শেষ ধন্য রাজার পুণ্য দেশ ॥

দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা
পুব দুয়ারী ঘরের প্রজা
পশ্চিম দুয়ারী ঘরের তাপ
উত্তর দুয়ারী ঘরের পাপ ॥

মধুমাসের ত্রয়োদশ দিনে
যদি হয় শনি
খনা বলে সে-বছর
হবে শস্যহানি ॥

আঁবে ধান তেঁতুলে বান ॥

কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা
বল্ গে চাষায় বাঁধতে আল
আজ না হয় জল হবে কাল ॥

কচু বনে ছড়াস ছাই
খনা বলে তার সংখ্যা নাই ॥

দূর সভা নিকট জল ॥

এইরকম ঢের ছড়া খনার নামে প্রচলিত। ডাক আর খনার সম্বন্ধে নানারকম বাজে গল্প রটানো আছে। মনে হয় নানা সময়ে গ্রাম্য লোকেরা বার বার দেখেশুনে যে-অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তাই এইরকম ছড়ার আকারে ডাক আর খনার নামে প্রচলিত।

অবশ্য ডাক আর খনা নামে সত্যকারের লোক হয়তো ছিলেন।

৫. প্রবাদবচন

বিদ্বানেরা বলেন, যে-ভাষায় প্রবাদবচন নেই, সে-ভাষা অসম্পূর্ণ। প্রবাদবচনে ছোট্ট ছোট্ট কথায় বড়ো বড়ো ভাব প্রকাশ করা যায়। প্রবাদবচনের সংখ্যা বাংলায় কম নয়। তার কতকগুলি সংস্কৃত বা অন্য ভাষার বই থেকে এসেছে, আবার কতকগুলি লোকের মুখে মুখে চলে আসছে।

গদ্য আর পদ্য, উভয় রূপেই প্রবাদবচন পাওয়া যায়।

অতি লোভে তাঁতি নষ্ট ॥
নাচতে না জানলে উঠানের দোষ ॥
অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট ॥
অনভ্যাসের ফোঁটা, কপাল চড়চড় করে ॥
একঢিলে দুই পাখি মারা ॥
বোঝার উপর শাকের আঁটি ॥
মাকড় মারলে ধোকড় হয় ॥
কাঙালের কথা বাসী হলে খাটে ॥

এগুলি প্রায়ই আমরা শুনি আর বলি। মিল-করা প্রবাদবচনগুলিও চমৎকার।

অকালে না নোঁয় বাঁশ
বাঁশ করে ট্যাঁশ ট্যাঁশ॥

পুড়ে পুড়ে রাঁধুনী ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাটুনী॥

যতনের মধু পিঁপড়ে খায়
অযতনের মধু গড়াগড়ি যায়॥

নদীতীরে বাস ভাবনা বারো মাস॥

কড়ি ফটকা চিঁড়ে দই কড়ি বিনে বন্ধু কই॥

যদি হয় সুজন তেঁতুলপাতায় ন্‌জন॥

যার শিল তার নোড়া তারি ভাঙি দাঁতের গোড়া॥

দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ॥

নিজের বেলায় আটিসুটি পরের বেলায় চিমটি কাটি॥

আছে গোরু না বয় হাল তার দুঃখ চিরকাল॥

এ-সব প্রবাদবচন নিশ্চয়ই অনেকে শুনেছেন। একটু লক্ষ করলেই বুঝতে পারা যায়, যথাসময় লাগসই ভাব প্রকাশ করতে এগুলি অদ্বিতীয়।

৬. ব্রতকথা

কতগুলি নিয়ম পালন করে বিশেষ বিশেষ সময়ে, কোনো দেবতার উদ্দেশে, নিজের সুখসৌভাগ্য কামনা করে, পূজা-অনুষ্ঠান করা আমাদের

দেশে অনেককাল থেকে চলে আসছে। এগুলির প্রায় সবই মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত।

পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য অনিশ্চিত। বড়ো হয়ে তাদের পরের ঘরে যেতেই হয়। কেউ বা মনোমতো ভালো-ঘরে প'ড়ে সারাজীবন সুখে কাটায়, কেউ বা মন্দ ঘরে প'ড়ে সারাজীবন দুঃখ পায়। তার ওপর সেকালে অনেককে সতিন নিয়েও ঘর করতে হত।

অদৃষ্ট মন্দ হলেই দুঃখ হয়। এই দুঃখভোগ যাতে না করতে হয়, সেইরকম কামনা ক'রে মন্দ অদৃষ্টকে ভালো করবার জন্যেই বোধ হয় মেয়েদের মধ্যে এতরকম ব্রত করার রীতি। আইবুড়ো-বেলা থেকেই মেয়েরা এই-সব ব্রত করে। এই ব্রতগুলি ছড়া (বা বাংলামন্ত্র) আছে। সেগুলিতে তখনকার কালের মনোভাব বেশ বোঝা যায়। যমপুকুর, পুণ্যিপুকুর, তুষতুষুলি, নাটাই, সেঁজুতি প্রভৃতি নানারকম ব্রত প্রচলিত। এখন মেয়েলি ব্রতের নানা বই ছাপানো হয়েছে। একটা ব্রতের ছড়ার নমুনা দেখা যাক। এটা তুষতুষুলি ব্রতের ছড়া—

তুষতুষুলি তুমি কে, তোমায় পূজা করি যে
ধনে ধানে বাড়ন্ত সুখে থাকি আদি অন্ত,
তোমলো লো তুষকুন্তি ধনে ধানে গাঁয়ে গুস্তি,
গাইয়ের গোবর সরষের ফুল, আসনপিঁড়ি এলোচুল,
গাইএ গোবরে সরষের ফুল, ওই করে পুজি বাপ মার কুল।
কোদালকাটা ধান পাব, গোহাল-আলো গোরু পাব,
দরবার-আলো বেটা পাব, সভা-আলো জামাই পাব,
সেঁজ-আলো ঝি পাব, হাঁড়িমাপা সিঁদুর পাব,
ঘর করব নগরে, মরব গিয়ে সাগরে (গঙ্গাসাগর তীর্থে)।

জন্মাব উত্তম কুলে
তোমার কাছে মাগি এই বর,
স্বামীপুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।

ব্রতের সব ছড়াগুলিতেই সুখসৌভাগ্য, ঐশ্বর্য আর শত্রুনিপাতের কামনা আছে। বড়োদের ব্রতকথার মধ্যে রামেশ্বর চক্রবর্তীর সত্য-নারায়ণের কথা অনেকেই জানেন, কিংবা শুনেছেন।

ছেলেদের এরকম অনুষ্ঠান বড়ো পাওয়া যায় না। তারা লেখাপড়া করে, কাজকর্ম করে। কালি তৈরি করার একটা ছড়া আর সরস্বতীর কাছে একটা প্রার্থনার ছড়া সকলেরই জানা—

কালি ঘটম্ কালি ঘটম্
সরস্বতীর পায়,
তোর দোয়াতের ভালো কালি
মোর দোয়াতে আয়॥

গলায় গজমোতি মুক্তার হার
দাও মা সরস্বতী বিদ্যার ভার॥

গীতিকাব্য

গীতিকাব্য বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ধর্ম, লোকাচার, প্রেম প্রভৃতি নানা বিষয় অবলম্বন করে গীতিগুলি রচিত।

সবচেয়ে যা প্রাচীন গান পাওয়া যায়, তা বৌদ্ধসাধকদের। তাতে তাঁরা নিজেদের সাধনার কথা বলেছেন, এই গানগুলি সব জায়গায় বোঝা যায় না। হাজার বছর আগেকার লেখা কিনা। ভাষা সেইজন্যে অনেকটা দুর্বোধ—

মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা
আসা বহল পাত-ফ[লা]-হ বাহা।
বরগুরু বঅনেঁ কুঠারেঁ ছিজউ
কাহ্ন ভণই তরু পুন ণ উইজউ। ধ্রু।

এ সেই পুরানো বাংলা। এতে ধর্মের কথা বলা হয়েছে। এর ভাবার্থ এই—

মন হচ্ছে গাছের মতো। পাঁচ ইন্দ্রিয়— চোখ কান নাক জিব আর ত্বক— সেই গাছের পাঁচটা শাখা। আশা তার পাতা আর ফল। মানুষের আশাই মানুষকে অসুখী করে ব'লে ধর্ম-আচরণে আশার মূল মনকে শান্ত করতে হয়। গুরুর বচনরূপ কুঠার দিয়ে মনতরুকে ছেদন করো, তা হলে সে আর জন্মাতে পারবে না। এই গানটি কানু আচার্য রচনা করেছেন তাই বলা হয়েছে "কাহ্ন ভনই"— অর্থাৎ কানু এই কথা বলছেন। গানের শেষে রচয়িতার নাম দেওয়াকে "ভণিতা" বলে। গানে ভণিতাদেওয়ার রীতি আগে খুব প্রচলিত ছিল।

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন নামে বইখানি খুব প্রাচীন। এই চণ্ডীদাস বড়ুচণ্ডীদাস বলে খ্যাত। আরো একজন চণ্ডীদাস ছিলেন তিনি দীনচণ্ডীদাস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এঁদের একজনের বাড়ি বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে আর-এক জনের বাড়ি বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে। চণ্ডীদাস দুজন না একজন এই নিয়ে দুদল পণ্ডিতের দুই মত। তার মীমাংসা এখনো পর্যন্ত কিছু ঠিক হয় নি। বাঁকুড়ার চণ্ডীদাসই শেষ বয়সে বীরভূমে এসে বাস করেছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। নূতন নূতন পুঁথি আবিষ্কারে চণ্ডীদাস-সমস্যা দিন দিন ঘোরালো হচ্ছে।

কংসের সভায় নারদ এসেছেন, বড়ুচণ্ডীদাস তার বর্ণনা করেছেন—

আয়িলা দেবের সুমতি গুণী
কংসের আগক নারদ মুনী।

পাকিল দাঢ়ী মাথায় কেশ
বামন শরীর মাকড় বেশ।
নাচএ নারদ ভেকের গতী
বিকৃত বদন উমত মতী।
খণে খণে হাসে বিণি কারণে
খণে হএ খোঁড় খোণেকেঁ কাণে।
নানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ
তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ।
লাম্ফ দিআ খণে আকাশ ধরে
খণেকেঁ ভূমিতে রহে চিতরে।
উঠিআঁ সব বোলে আনচান
মিছাই মাথাএ পাড়এ সান।
মেলে ঘন ঘন জীহের আগ
রাঅ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ।
দেখিআঁ কংসেত উপজিল হাস।
বাসলী[১] বন্দী গাইল চণ্ডীদাস।

কবিতার বানানগুলো লক্ষণীয়। এখনকার বানানের সঙ্গে ঠিক মেলে না। এবার দীনচণ্ডীদাসের একটা পদ দেখা যাক।—

শ্রীকৃষ্ণ ছেলেমানুষ। মা যশোদা তাঁকে গোরু চরাতে পাঠিয়েছেন। তাই দেখে একজন দুঃখ করে বলেছেন—

সই কী আর বলিব মায়,
তিল দয়া নাহি তাহার শরীরে
একথা কহিব কায়।

১ বাসলী— চণ্ডীদাস পূজিতা দেবী। নান্নুর গ্রামে এঁর মূর্তি ও মন্দির বর্তমান রয়েছে।

মায়ের পরান এমনি ধরন
তার দয়া নাহি চিতে।
এমন নবীন কুসুম চরণ
বনে নহে পাঠাইতে।
কেমন ধাইব ধেনু ফিরাইব
এ হেন নবীন তনু,
অতি খরতর বিষম উত্তাপ
প্রখর গগন ভানু ;
বিপিনে বেকত ফণী শত শত
কুশের অঙ্কুশ তায়,
সে রাঙা চরণে ছেদিয়া ভেদিব
মোর মনে হেন ভায়।
আর এক আছে কংসের আরতি
জানি বা ধরিয়া লয়।

চণ্ডীদাস কয় না ভাবিহ ভয়
সে হরি জগতপতি
তারে কোনো জন করিব তাড়ন
এমন না দেখি কতি॥[১]

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন নবদ্বীপে ৮৯২ বঙ্গাব্দে, ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে। পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম

১ চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর রাধাকৃষ্ণের প্রেম নিয়ে অনেক পদ রচনা করেছেন। সেগুলি বাঙালিরা গেয়ে গেয়ে এমন ভাবে নিজস্ব করে নিয়েছেন যে, এখন সেগুলি বাংলা সাহিত্যের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, যদিচ তা মৈথিলি ভাষায় রচিত।

শচীদেবী। এঁর আসল নাম বিশ্বম্ভর। অল্প বয়সেই ইনি অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করেন কিন্তু পাণ্ডিত্য ও খ্যাতির দিকে লক্ষ্য না দিয়ে দিলেন ধর্মের দিকে মন। সে সময়ে ধর্ম ও সমাজের বড়ো দুরবস্থা ছিল। বিশেষত হিন্দুসমাজে নিম্নশ্রেণীদের মধ্যে দুর্দশার অন্ত ছিল না। বিশ্বম্ভর তাঁর সমস্ত প্রতিভা সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন এই-সব নিম্ন-শ্রেণী আর উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ধর্মের ভেতর দিয়ে একতা আনতে।

চব্বিশবছর বয়সে ইনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। গুরু কেশবভারতী এঁর বিশ্বম্ভর নাম বদলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম দেন। তার পর তিনি ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করেন।

তাঁর এই ধর্মের আশ্রয়ে এসে বাংলা দেশে নবজাগরণের সাড়া পড়ে গেল। ইনি সহায়ও পেলেন অনেককে। শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্য আর একচক্রার নিত্যানন্দ দুইজন চৈতন্যদেবের প্রধান সহায় ও সহকর্মী। বাংলার নবাব হোসেনশার মন্ত্রী ও মুন্সি সনাতন আর রূপ, সপ্তগ্রামের জমিদারের ছেলে রঘুনাথ, শ্রীখণ্ডের নরহরি ঠাকুর প্রভৃতি দেশের বড়ো বড়ো লোক চৈতন্যদেবের অনুবর্তী হন।

সন্ন্যাসের পর চৈতন্যদেব পুরীতে গিয়ে বাস করতে থাকেন। পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্র এঁকে দেবতার মতো মানতেন। চৈতন্যদেবের অনুবর্তী ভক্তদের দ্বারা অসংখ্য বই সংস্কৃতে আর বাংলায় লেখা হয়েছে।

ভালোবাসার ভেতর দিয়েই ভগবান সহজে ভক্তের কাছে ধরা দেন। তা তাঁকে প্রভু, পিতা, সখা বা পতি যে ভাবেই ভালোবাসা যাক-না কেন। যাঁরা ভগবানকে ভালোবাসেন তাঁরা সবাই সমান, এই ছিল চৈতন্য-দেবের বক্তব্য। আটচল্লিশ বছর বয়সে ইনি ধরাধাম ত্যাগ করেন।

তাঁর জন্মের আগে বাংলাসাহিত্যের যে-চেহারা ছিল, জন্মের পরে তাঁর অনুগত ভক্তবৃন্দের দ্বারা সে-চেহারা ভাবে ও ভাষায় একেবারে বদলে গেল। চণ্ডীকাব্য প্রভৃতিতে ভক্তে আর দেবতায় ছিল দূরত্ব। এঁদের

কাব্যে ভক্তে আর দেবতায় ঘটল একত্ব। মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম বাংলাদেশকে প্লাবিত করে দিল নতুন ভাবে। সেই ভাবকেই অবলম্বন করে গড়ে উঠল বৈষ্ণবসাহিত্য। এই সাহিত্যে মানুষের ভয় ও আত্মাবমাননার বিকৃতি নেই, আছে প্রেম ও আত্মপ্রতিষ্ঠার গৌরব।

সেইসময় যে-সব গান রচনা হল তার তুলনা আর মেলে না। যে দীন-চণ্ডীদাসের কথা আগে বলেছি তিনি নাকি মহাপ্রভুর পরবর্তী লোক। তা ছাড়া জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, নরোত্তমদাস, নরহরিদাস, বাসুঘোষ, নাসির মামুদ, সালবেগ, সৈয়দ মর্তুজা, রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি বহু কবি গান রচনা করেন। এঁদের এই গানগুলিকে পদাবলী বলা হয়।

এই-সব বৈষ্ণবকবিদের পদ এখনো সর্বত্র কীর্তন করা হয়। দল বেঁধে খোলকরতাল নিয়ে গান করাকে কীর্তন বলে। পদাবলী সংগ্রহ করে ছাপানো হয়েছে।

পদগুলিতে কৃষ্ণের আর চৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত্রবর্ণনা করা হয়েছে। আবার কতকগুলিতে স্তবস্তুতি, কতকগুলিতে ভগবানের নামমাহাত্ম্যও বলা হয়েছে। এই বৈষ্ণবকবিদের ভাব নিয়ে পরবর্তী যুগে অসংখ্য কবির কাব্য রচিত হয়েছে, আর এখনো হচ্ছে।

হাজার চারেকের ওপর বৈষ্ণবপদ ছাপা পাওয়া যায়— সেগুলি বিচিত্র রসে ভরা। একটিমাত্র এখানে উদাহরণ স্বরূপে দেওয়া গেল। রাধা শ্রীকৃষ্ণকে নিজের আকুলতা জানাচ্ছেন—

হেদে হে নাগর বর, শুন হে মুরলীধর
নিবেদন করি তুয়া পায়
চরণ নখর মণি যেন চাঁদের গাঁথনি
ভালো শোভে আমার গলায়।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে যখন বনে যাও রঙ্গে
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে

মনে করি সঙ্গে যাই গুরুজনার ভয় পাই
আঁখি রৈল তুয়া পানে চেয়ে।
চাই নবীন মেঘের পানে তুয়া বঁধু পড়ে মনে
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি
রন্ধনশালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।
মণি নও মাণিক্য নও আঁচলে বাঁধিলে রও
ফুল নও যে কেশে করি বেশ
নারী না করিত বিধি তুয়া হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।
অগুরু চন্দন হইতাম তুয়া অঙ্গে মাখা রইতাম
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙা পায়
কী মোর মনের সাধ বামন হৈয়া চাঁদে হাত
বিধি কি সাধ পুরাবে আমায়।
নরোত্তম দাসে কয় তোমার উচিত হয়
তুমি আমায় না ছাড়িহ দয়া
যেদিন তোমার ভাবে আমার এ দেহ যাবে
সেই দিন দিয়ো পদছায়া॥

বৈষ্ণবেরা যেমন রাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধে পদ রচনা করেছেন তেমনি কিছু পরে শাক্ত কবিরা শক্তি অর্থাৎ কালীর সম্বন্ধে নানা ভাবের পদ রচনা করেছেন। এঁরা জগন্মাতার মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করে বিভোর হয়েছিলেন। শাক্ত পদের মধ্যে রামপ্রসাদ সেনের আর কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের গানগুলি প্রসিদ্ধ। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই মুখে এই পদগুলি দেশময় প্রভাব বিস্তার করে ছড়িয়ে আছে। রামপ্রসাদের একটি গান—

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে
মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে।
করে অসি মুণ্ডমালা, সে মা টি কি মাটির বালা
মাটিতে কি মনের জ্বালা দিতে পারে মিটাইয়ে?
শুনেছি মার বরন কালো সে কালোতে ভুবন আলো
মায়ের মতো হয় কি কালো মাটিতে রং মিশাইয়ে।
মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চন্দ্র সূর্য আর হুতাশন
কোন কারিগর আছে এমন দেবে একটি নিরমিয়ে?
অশিব নাশিনী কালী সে কি মাটি খড় বিচালি
সে ঘুচাবে মনের কালি প্রসাদে কালী দেখাইয়ে॥

এর পর আসে বাউল সম্প্রদায়ের কথা। এঁদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই আছেন। এঁদের গানে ভাষায় আর সুরে এমন একটা আকর্ষণ-শক্তি আছে যে শুনলে মন মুগ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এঁদের গানের ভাব সহজে ধরা যায় না। যেমন—

ধন্য আমি বাঁশিতে তোর আপন মুখের ফুঁক
এক বাজনে ফুরাই যদি নাইরে কোনো দুখ।
ত্রিলোকধাম তোমার বাঁশি আমি তোমার ফুঁক
ভালো মন্দ রন্ধ্রে বাজি সুখ আর দুখ
সকাল বাজি সন্ধ্যা বাজি বাজি নিশুইৎ রাতে
ফাগুন বাজি সাওন বাজি তোমার মনের সাথে
একেবারেই ফুরাই যদি কোনো দুঃখ নাই
এমন সুরে গেলাম বাইজ্যা আর কী আমি চাই॥

প্রেমসম্বন্ধে যাঁরা গান লিখেছিলেন তাদের মধ্যে হরুঠাকুর ও নিধুবাবু খ্যাতি লাভ করেন।

এই ধরণের গান ছাড়া নৌকা-চালানোর সময় মাঝিদের সারিগান, সঙের গান, ময়ূরপংখির গান, গাজনের গান, গাজির গান, পীরের গান প্রভৃতি নানারকম গান আছে। এক কথায় বলতে গেলে আমাদের বাংলাসাহিত্য ফুলে-ভরা সাজির মতো নানারকমের, নানা ভাবের গীতিকাব্যে ভরা।

অনুবাদ-সাহিত্য

একদল লোক ছিলেন যাঁরা সংস্কৃত বা অন্য ভাষা থেকে নানা বই বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এই অনুবাদের জন্য দেশের রাজারা নবাবেরা খুব উৎসাহ দিতেন, অর্থও দিতেন। রামায়ণ মহাভারতের যাঁরা অনুবাদ করেছেন, তাঁদের মধ্যে কৃত্তিবাস আর কাশীরাম দাসের নাম বঙ্গবিশ্রুত। দুশো বছর আগেকার রঘুনন্দন গোস্বামীর লেখা রামরসায়ণ নামে রামায়ণখানি অতি সুললিত ভাষায় লিখিত। সে বই রাঢ় অঞ্চলে প্রসিদ্ধ।

শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, কাশীখণ্ড, হরিবংশ প্রভৃতি অনেক বইয়ের বাংলায় অনুবাদ করা হয়। চৈতন্যপূর্ববর্তী মালাধর বসুর কৃষ্ণবিজয় নামে কাব্যখানি শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ অবলম্বন করে লেখা। এখানি ভাবে ও ভাষায় উৎকৃষ্ট। যদুনন্দন ঠাকুরও সেকালের একজন নামজাদা অনুবাদক— ইনি অনেকগুলি সংস্কৃত বৈষ্ণবগ্রন্থের সুললিত অনুবাদ করে গেছেন। অনুবাদগুলি প্রায়ই পদ্যে করা। সভায় যেমন মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি গাওয়া হয়, তেমনি এই-সব অনুবাদগুলিও সভায় সুর করে প'ড়ে মানে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। মূল বইগুলি সংস্কৃতভাষায় লেখা ব'লে তাতে কী আছে তা সকলে জানতে পেত না। এই অনুবাদের জন্য শত শত নিরক্ষর লোক শাস্ত্রের কথা জানতে পেরেছে।

চরিতকাব্য

আবার একদল লোক জীবনচরিত লিখেছেন। এই জীবনচরিতের মধ্যে চৈতন্য মহাপ্রভু আর তাঁর সঙ্গীদের জীবনের কথাই বেশি।

চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী নিয়ে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, কবিরাজ কৃষ্ণদাসের চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি ; আর অদ্বৈতপ্রভুর চরিত্র নিয়ে— ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল লেখা হয়।

এইরকম কর্ণানন্দে ও নরোত্তমবিলাসে নরোত্তম ঠাকুরের জীবনী, ভক্তিরত্নাকর ও প্রেমবিলাসে শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনী, রসিকমঙ্গলে রসিকানন্দ ঠাকুরের জীবনী বর্ণিত হয়েছে। এইরকম মহাপুরুষদের চরিত্র অবলম্বন করে ভক্তমাল প্রভৃতি অনেকগুলি ছোটো বড়ো বই লেখা হয়।

নাটক ও যাত্রাভিনয়

সব সময় ধর্মকর্ম নিয়ে থাকা সকলের পছন্দ নয়। তাই যাত্রা-উৎসব উপলক্ষে ধুমধাম করা অনেক দিন থেকে আমাদের মধ্যে চলে আসছে। পূর্বকথিত মঙ্গলগান, কীর্তন প্রভৃতি যেগুলি জনসাধারণে প্রচলিত, সেগুলিতে একটি গাম্ভীর্য ছিল। কিন্তু নিছক আমোদপ্রমোদ আর মজা করবার জন্যও তো চাই কিছু। মনে হয় সেজন্যে নাটক, কবি, পাঁচালি, তরজা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে। অভিনয় (নাটক) করা ভারতবর্ষে খুব প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। কাজেই বাংলাদেশেও তা বাদ যায় নি। তবে এখন যে-আকারে নাটক-অভিনয় হয়, সেকালে সে-আকারে হত না।

নেপালের রাজার পুস্তকালয় থেকে খানকয়েক বাংলানাটক পাওয়া গিয়েছে। সেই-সব নাটকে গদ্যে কথাবার্তা নেই, কেবল ছোট্ট ছোট্ট পদ্যে বা গানে কথাবার্তা চলেছে দেখতে পাই। পরবর্তীকালে বাংলার যাত্রাওয়ালারা বড়োরকমের দল বেঁধে নাটকের অভিনয় আরম্ভ করেন।

পুরানো নাটকে রামায়ণ মহাভারত আর পুরাণের ঘটনাই বেশি থাকত। অভিনয়ের সময় কোনো পাত্রবিশেষকে সঙ্ সাজিয়ে দর্শকদের খুব হাসানো হত।

বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, লোকা ধোপা, গুপি হাড়ি, নীলকণ্ঠ মুখুজ্যে, মতি রায়, কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রভৃতি কয়েকজন যাত্রার জন্য বিখ্যাত হন, বিদ্যাসুন্দর অভিনয় ক'রে গোপাল উড়ের দল প্রসিদ্ধি লাভ করে।

যাত্রাতে অনেক লোক লাগে, তোড়জোড় খুব বেশি করতে হয়। কিন্তু পাঁচালিতে অত লোক লাগে না; একজন ছড়া কাটে, আর মাঝে মাঝে গান করে, গানের সময় দু-চারজন পালি দোহারকি দেয়, সঙ্গে সঙ্গে ঢোল বাজে। এই পাঁচালিতে লোকে খুব আমোদ পেত। কেননা, পাঁচালির রচনা শ্রুতিমধুর আর কৌতুকজনক। এক দিকে যাত্রা যেমন জনপ্রিয় হয়েছিল অপর দিকে পাঁচালিও তেমনি জনপ্রিয় হয়। যাত্রা ও পাঁচালির বিষয়বস্তু একই, হয় পৌরাণিক নয় লৌকিক। পাঁচালিতে বলিরাজার উপাখ্যান চলছে। নারদ চলেছেন বীণা বাজিয়ে—

বলে নারদের বীনে
ও হরি আরাধন বিনে দিন যায় বৃথে।
চিন্ত রে দুরন্তভাবের ভয়ান্ত হইবে যাতে।
স্থির করো নিজ চিত্ত হরিপদে রাখো নেত্র
পবিত্র হবে তোর ক্ষেত্র অত্র সন্ধ নাস্তি ইথে॥

মনে মনে মন্ত্রণ করে মহামুনি ধীরে ধীরে
কৈলাস শিখর 'পরে যাচ্ছেন
বাজে বীণা সুমধুর তাহে মিলাইয়া স্বর
শ্রীহরি-গুণানুবাদ গাচ্ছেন।
পুলকিত অন্তরে প্রবেশি কৈলাস পুরে
দেবঋষি চারিদিকে চাচ্ছেন,
দেখেন মুনি কোনো স্থানে ভূত প্রেত দানাগণে
শিব নামে মত্ত হয়ে নাচ্ছেন।
ময়র ময়ূরী কত নৃত্য করে অবিরত
মারুত মন্দ মন্দ বহিছে
ডালে বসি পিকবর হানিছে পঞ্চম স্বর
ফলে ফুলে বৃক্ষ শোভা হয়েছে।

সে শোভা কেমন—

ব্রজের শোভা কৃষ্ণচন্দ্র নদের শোভা গোরা
নিশির শোভা শশী যেমন শশীর শোভা তারা।
বৈষ্ণবের টিকি শোভা মোল্লার শোভা দাড়ি
নগরের শোভা যেমন অট্টালিকা বাড়ি।
সমুদ্রের ঢেউ শোভা ঢাকের শোভা টোয়ে
তেমনি শোভা দেখেন মুনি কৈলাসে আসিয়ে।

পাঁচালিরচনার এই হল নমুনা।

পাঁচালিকারদের মধ্যে দাশরথি রায় ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। সেকালে এঁর যশ আর আদর ছিল অফুরন্ত। এখনকার কালে পাঁচালি হয়তো সকলের পছন্দ হবে না। ব্রজ রায়, রসিক রায় প্রভৃতি অনেকেই পাঁচালি রচনা

করে খ্যাতি লাভ করে গেছেন। আজকাল আমাদের দেশ থেকে পাঁচালি প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে।

সেকালে আর-একরকম গানের প্রচলন ছিল, তাকে বলত কবি-গান। কবিগানে দুটো দল থাকে। একদল অন্যদলকে পদ্যে প্রশ্ন করে, অপর দলও পদ্যে উত্তর দেয়। ঠিক ঠিক উত্তর দিতে না পারলে ঠকে যেতে হয়। এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের সময় অশ্রাব্য গালাগালি পর্যন্ত চলতে থাকে। সেজন্যে কেউ কেউ কবিগান পছন্দ করে না। কবিগান আজও ক্ষীণ প্রাণ নিয়ে টিঁকে আছে কোনোরকমে।

এই কবিগানেরই রকমফের তরজা, ঝুমুর, ফুল-আখড়াই, হাফ-আখড়াই প্রভৃতি। সবগুলিতেই উত্তর-প্রত্যুত্তর থাকে।

একজন খাস পোর্তুগীজ বাংলাদেশে এসে এমনি বাংলা শিখেছিলেন যে, তিনি একটা কবির দলই করে ফেললেন। তাঁর নাম এণ্টনি সাহেব। ভোলাময়রা বলে একজন কবি অনেক ক্ষেত্রে এণ্টনি সাহেবের প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে উক্তি-প্রত্যুক্তি করতেন। যেমন, আসরে উঠে এণ্টনি সাহেব গান ধরলেন—

ভজন পূজন জানিনে মা জেতেতে ফিরিঙ্গি,
যদি দয়া করে তারো মোরে এ ভবে মাতঙ্গী।

তখন ভোলাময়রা মাতঙ্গী অর্থাৎ দুর্গার জবানিতে উত্তর দিলেন :

তুই জাত ফিরিঙ্গি জবরজঙ্গী আমি পারব নাকো তরাতে
তোরে পারব নাকো তরাতে।
শোন্‌রে ভ্রষ্ট বলছি স্পষ্ট তুইরে নষ্ট মহাদুষ্ট
তোর কি কালী কৃষ্ট ইষ্ট ভজগে যা তুই যিশুখৃষ্ট
শ্রীরামপুরের গির্জাতে।

এণ্টনি আবার প্রত্যুত্তর দিলেন :

সত্য বটে আমি হচ্ছি জাতিতে ফিরিঙ্গি,
ঐহিকে লোক ভিন্ন ভিন্ন অন্তিমে সব একাঙ্গী। ইত্যাদি।

এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে একজন পর্টুগালের লোক বাঙালির আসরে দাঁড়িয়ে মুখে মুখে ছড়া তৈরি করে জবাব দিয়ে যাচ্ছে। এটা কম শক্তির পরিচয় নয়।

এই কবিওয়ালাদের মধ্যে গোঁজলা গুঁই, হরু ঠাকুর, ভবানী বেনে, নিত্যানন্দ বৈরাগী প্রভৃতি কয়জন খুব নামজাদা হয়ে ওঠেন। অনেকের মত ১৭০০ খ্রীস্টাব্দের প্রথম থেকেই কবিগানের চলন হয় আর গোঁজলা গুঁই এর প্রবর্তক। এই কবিওয়ালাদের মধ্যে অকাবাই, যজ্ঞেশ্বরী, মাধবী মোহিনী প্রভৃতি দু-চারজন মেয়ে-কবিও ছিলেন।

ধামালি বলে আর-এক জাতীয় গান আমাদের দেশে ছিল। ধামালি মানে রঙ্গরস, হাসিঠাট্টা। এই ধামালি গান সব জায়গায় সব সময় হতে পারত না।

গদ্য

এতক্ষণ পর্যন্ত যে-সব গান-গল্পের কথা বলা গেল সেগুলি সবই পদ্যে লেখা। সেকালে সাহিত্যে গদ্যে-লেখার রীতি প্রায় ছিল না। অবশ্য চিঠিপত্রে আর দলিল বা দানপত্রে গদ্য লেখা চলত। কাজেই সাহিত্যের গদ্য কী রকম ভাবে পড়তে হয় তাও সাধারণের জানা ছিল না। পরবর্তী-যুগে রাজা রামমোহন রায় যখন গদ্য লিখে জনসাধারণের মধ্যে চালান, তখন গদ্য পড়বারও একটা নিয়ম করে সকলকে জানাতে হয়েছিল। এতেই সেকালের গদ্যের অবস্থা বোঝা যায়।

পুরোনো গদ্যের মধ্যে বই-আকারে যা পাওয়া যায় তা সহজিয়া বৈষ্ণবদের বই। ছোটো ছোটো বাক্য গদ্য দিয়ে রচিত। যেমন :

সম্প্রদায় কয়। সম্প্রদায় চারি। রামানন্দী শ্যামানন্দী নিমানন্দী মাধবাচার্য একুন চারি সম্প্রদায়। তোমরা কোন্ সম্প্রদায়। নিমানন্দী। ধর্ম কোন্ রাগ। বৈধিক। যজক কোথাকার। ব্রজবাসী ইত্যাদি।

ছোটোবাক্যে প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে রচিত বলে এগুলি বেশ সহজ। চিঠিপত্র ও দলিল-দানপত্রের গদ্য তত ভালো ছিল না। কমা সেমিকোলন প্রভৃতি কোনো চিহ্ন ছিল না, ছিল একমাত্র দাঁড়ি।

সেকেলে একখানি চিঠির নমুনা দিচ্ছি। চিঠিখানি 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' বই থেকে নেওয়া হয়েছে। বইটিতে আড়াই শো বছর আগেকার সাধারণ বাঙালি-সমাজের নানা কথা আর তখনকার দিনের চল্‌তি গদ্যের ভঙ্গি পাওয়া যাবে। এই গ্রন্থখানি বিশ্বভারতী থেকে বের হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে মুদ্রিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'। নামে বই তখনকার কালের অনেক জানবার পক্ষে অদ্বিতীয় সংগ্রহ।

[৭ঁ শ্রীশ্রীহরিঃ—
স্বরনং।—]
শ্রীমন্মদীশ্বর পূজ্যতা—
চরণ সরসীরুহরাজো—

সেবক বাজপেয়িরাজ শ্রীশম্ভুচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ প্রণামাঃ পরার্দ্ধং নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ শ্রীচরণধ্যানাদেব সেবকৈহিক পারত্রিক নিস্তারঃ। দুই দফা আজ্ঞা পত্র পাইয়া শিরোবন্দিত করিয়া সংবাদ জানিয়াছি। শ্রীশ্রী৺কৃপায় নানা বিঘ্নোপশম হইয়া উনিশা তারিখে শ্রীযুত ঠাকুর পুত্রের শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে চরিতার্থ হইলাম [।] নানা বিঘ্নের দফায় নানা প্রকার শুনা গিয়াছে। সাক্ষাত আজ্ঞা হইলেই তদ্বিস্তারিত জানিব। তচ্ছুভ বিবাহের দফায় বিপক্ষ কতক ভব্যতা করিয়াছে। তাহাতে তন্মতি বিপর্য্যয় বুঝিলাম [।] ঠাকুরের পদে একটা ক্ষত হইয়াছে

ঔষধের বহির নকল ঠাকুরের নিকটে আছে। তন্মধ্যে ক্ষতর মহৌষধ কাল্যা লতার পাতার দফা লেখা আছে। তাহা স্মৃতি না থাকনের সন্দেহ জন্যে এরূপ নিবেদন লিখিলাম। ক্ষতে ঐ পাতা বাধা কিম্বা ঐ পাতা বাটিয়া ক্ষতে প্রলেপ দিয়া শুষ্ক হইলে তপ্ত জলে উঠান। পুনশ্চ প্রলেপ দেয়া। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিলে দুষ্ট রসাদি নির্গত হইয়া ক্ষত শুষ্ক শীঘ্র হয় অতএব বিহিতাজ্ঞা হবেক। বহিতে তদ্ভাষা কবিতা লেখা আছে [।] হটাত তাহা না পাওআ যায় তা তদ্ভাষা কবিতাও লিখি। ক্ষতে কাল্যা লতার পাতা শুষ্ক ক্ষতে প্রলেপ। ইহাতে নিস্চয় জান হয় ক্ষত ক্ষেপ্‌॥ গদখালির নিকট বালিয়ালি গ্রামের শ্রীযুত রামনিধি চক্রবর্ত্তির এক কন্যাকে মণ্ডওায় আনাইয়া ঐ কন্যার সহিত সাতাইশা শনিবার সতর দণ্ড[১] রাত্রির পর পাচ দণ্ডের মধ্যে শ্রীযুত নীলানাথ রায়ের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। স্বগোচর কারণ নিবেদন লিখিলাম। শ্রীযুত [গ ে] ণশচন্দ্র রায়ের ক্ষয় রোগে পর পর কাহেলি[২] বৃদ্ধি। বাহে[৩] রাখাইয়া চিকিৎসাদি হইতেছে। কিন্তু ধারা ভাল নহে। বাটির আর সকলে ভাল আছেন। এখানে ঠাকুরের শুভাগমনের গৌণ থাকে তো লোক সঙ্গে দিয়া শ্রীযুত কালিদাস রায় মহাশয়কে এখানে পাঠাবেন। তবে তাঁহার লিখনও পাঠাদি হবেক। অগ্রহায়ণ ত্রিংশত্তম দিবসীয়া শ্রীচরণ নিবেদন লিপিরিয়ং—

[সন ১২২৩ সাল ৩০ অগ্রহায়ণ]

সত্যকথা বলতে কী, সাহিত্যিক বাংলা-গদ্যরচনার সৃষ্টি হয়েছে ইংরেজ আমলে, তার অন্যতম স্রষ্টা রাজা রামমোহন রায়।

১ সে যুগে বিলিতি ঘড়ির চলন ছিল না তাই দণ্ড উল্লেখ করা হতো। বঙ্কিমবাবু-রবীন্দ্রনাথের লেখা অনেক বইয়ে দণ্ড উল্লেখ আছে। ১ দণ্ড—২৪ মিনিট।

২ দুর্বলতা।

৩ বাড়ির বাইরে।

আধুনিক যুগ

গদ্যরচনা

বাংলায় ইংরেজরাজত্বের আরম্ভ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে-যুগ তাকে আধুনিক যুগ ব'লে ধরা গেল। এই যুগই বাংলাসাহিত্যের চরম উন্নতির কাল। ভারতচন্দ্র রায় আর রামপ্রসাদ সেন এই যুগের আদিতে বর্তমান।

পোর্তুগীজ ও ইংরেজ মিশনারিরা এসে তাঁদের ধর্মপ্রচার করতে আরম্ভ করলেন। তখন ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুত্থান হল, তার ফলে এদেশে খ্রীস্টানধর্মের প্রসার গেল কমে। মিশনারিদের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে প্রতিবাদগুলি সব গদ্যেই লেখা হত। রাজা রামমোহন ছিলেন এর অগ্রণী। তিনি বেদ উপনিষদ প্রভৃতি নানা শাস্ত্র থেকে যুক্তি সংগ্রহ করে লিখতে লাগলেন বাংলায়। এই সময় দু-একখানা সংবাদপত্রও বেরুতে লাগল। তা অবশ্য গদ্যেই লিখতে হত।

এমনি করে কিছুকালের মধ্যে বেশ খানিকটে গদ্য বাংলাতে জমে উঠল। রামমোহনের আগেকার সাহিত্যিক গদ্য কিম্ভূতকিমাকার ছিল এই সময় বাংলাদেশে যে-সব ইংরেজরা আসেন, তাঁরাও বাংলা শিখে বইপত্র লিখতে আরম্ভ করেন। কতগুলি গদ্যের নমুনা দেওয়া গেল।

কেরি সাহেবের লেখা গদ্য :

"আঃ মহাশয় এই যে খবর করিয়াছে তাহাকে কি বলিব উহারে তো দিয়াছে আর উহার সঙ্গে দশ বার জনকে বিদায় এক এক জনকে দশ বার টাকা করিয়া দিয়াছে। আর উহাকে কতই সয়।"

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের গদ্য :

"দূরবর্তী হট্টগামী লোকদের শ্রবণ-বিষয়ীভূত হট্টাগত ধ্বনিমাত্রাত্মক কেবল কোলাহল হয়। অনন্তর কতিপয় পথ গমনোত্তর সমনস্ক শ্রবণেন্দ্রিয় সন্নিকট বশতঃ খণ্ডশঃ বর্ণমাত্র গ্রহণ হয়। তদুত্তর বসনভূষণকদলীমূলক

ইত্যাদি পদমাত্র শ্রবণ হয়। হট্টনিকটপ্রাপ্তযুক্তর ক্রয়বিক্রয়কারীপুরুষদের বাক্যশ্রুতি হয়।" তবে মৃত্যুঞ্জয় চলিত ভাষায় সরল গদ্যও লিখে গেছেন।

মার্সম্যান সাহেবের গদ্য :

"ইহাতে একটা দাঙ্গা উপস্থিত হয় এবং তাহাতে ঐ ফৌজদারের পিতা এক তলোয়ারের দ্বারা মস্তকাঘাতী হইলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধীর উপরেও ঐ উকীল স্বয়ং এক পিস্তলের দ্বারা গুলি নিক্ষেপ করিয়া আঘাতী করিলেন।"

তখনকার সংবাদপত্রগুলির ভাষাও এইরকম ছিল। এই গদ্যপড়ার সময় অর্থের গোলমাল হতে পারে, সেজন্য রাজা রামমোহন গদ্যপড়ার যে নিয়ম করেছিলেন তার খানিকটা এই—"যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎপর্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন।"

এতেই বুঝতে পারা যায়, এই নতুন প্রচলিত গদ্যকে নিয়ে বিদ্বানদের মধ্যে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গদ্যকে বর্তমান সাহিত্যিক গদ্যের অন্যতম আদিরূপ বলে গণ্য করা যায়। তার একটা উদাহরণ এই :

"আমি একবার জমিদারী কালীগ্রামে যাই। অনেক দিনের পর বাড়িতে ফিরি। আমি পদ্মার উপর বোটে। তখন বর্ষাকাল, আকাশে ঘোর ঘনঘটা। বেগে বায়ু উঠিয়াছে। পদ্মা তোলপাড় হইতেছে। মাঝিরা ভারি তুফান দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। কিনারায় বোট বাঁধিয়া ফেলিল।"

এ যেন ঠিক এখনকার লেখার মতো। এঁর সমস্ত বই এইরকম

ভাষায় লেখা। পরে কালীপ্রসন্ন সিংহ পণ্ডিতদের দিয়ে মহাভারতের গদ্য-অনুবাদ করান। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন রামায়ণের অনুবাদ করেন। এই দুখানি বইয়ের ভাষাও বেশ সুন্দর।

সাহেব মিশনারিরা বাইবেলের অনুবাদ, বাংলাব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতির গোড়াপত্তন করেন। কাজেই বর্তমান বাংলার গোড়ার দিকে সাহেবদের দান ও প্রচেষ্টা খুব ছিল। শ্রীরামপুর এঁদের কেন্দ্রস্থান। সেখান থেকেই প্রথম এদেশে বাংলা বই ছাপা হয়। তার আগে রোমান অক্ষরে বাংলা বই প্রথম ছাপা হয় লিসবন থেকে। পোর্তুগীজ পাদরীরা তা ছাপেন। এই প্রচেষ্টার জন্য কেরি, ওয়ার্ড, মার্সম্যান প্রভৃতি সাহেবের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে বাংলাগদ্য-রচনার রীতি সুস্পষ্টরূপ ধারণ করে। বস্তুত ঈশ্বরচন্দ্রকে বাংলা গদ্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠপ্রবর্তক ব'লে গণ্য করা হয়।

এর পর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্তমান বাংলায় যুগান্তর আনলেন। তাঁর বঙ্গদর্শন-নামক মাসিকপত্রে প্রবন্ধ ও উপন্যাস লিখে বাংলাগদ্যের চেহারা দিলেন বদলে। রাজনারায়ণ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীরা উৎকৃষ্ট ধরণের গদ্য লিখতে আরম্ভ করেন।

আধুনিক কালের বাংলাসাহিত্যে গদ্যসৃষ্টিই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো কথা। এখন ভারতীয় সাহিত্যগুলির মধ্যে বাংলার গদ্য-সাহিত্য হয়ে রয়েছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

পদ্যসাহিত্য

প্রায় সব ভাষার সাহিত্যে গোড়ার দিকে দেখি পদ্য। কারণ লেখকদের পদ্যের দিকে ঝোঁক থাকা স্বাভাবিক। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভৃতির কাহিনী ছাড়া জনসাধারণকে অবলম্বন করেও

সাহিত্যরচনা চলেছিল। এরকম অনেকগুলি কাহিনী ময়মনসিংহ প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার লোকদের মুখ থেকে শুনে সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলি লোকসাহিত্যের মধ্যে গণ্য হলেও এর এক-একটি পূর্ণাঙ্গ বলে এখানেই তার উল্লেখ করা গেল। এই-সব গল্প ছড়ার মতো, এগুলি এখন 'গীতিকা' নামে পরিচিত। গ্রাম্য কবির লেখা বলে এর ভাষা তেমন মার্জিত নয়, কিন্তু ভাব আর বর্ণনা অকৃত্রিম হওয়ায় এগুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। গীতিকাগুলি থেকে এবার দু-একটা গল্প শোনানো যাক।

মহুয়া

বেদেদের সর্দার হোমরার চুরি করে আনা মেয়ের নাম মহুয়া। মেয়েটি অতি সুন্দরী। হোমরার দল দেশবিদেশে নানারকম তামাশা দেখিয়ে বেড়ায়। মহুয়া বাঁশের ওপর, দড়ির ওপর, নেচে খাসা কসরত দেখাত। বামুনডাঙার রাজপুত্র নদেরচাঁদ খেলার চেয়ে ভুললেন মহুয়ার রূপে। রাজ্য ত্যাগ করে রাজপুত্র বেদেদের পেছনে পেছনে ঘুরে, শেষে মহুয়াকে নিয়ে পালালেন। নানা বিপদ আপদ সহ্য করে তাঁরা নির্জনে ঘরসংসার পেতে সুখে বাস করতে লাগলেন।

হোমরার ইচ্ছে ছিল তার দলের সুজন বেদের সঙ্গে মহুয়ার বিয়ে হয়। অকস্মাৎ মহুয়ার পালানোতে সে চটে গিয়ে খোঁজ করতে করতে এসে ধরল। তখন হোমরা একখানা বিষ-মাখানো ছুরী মহুয়ার হাতে দিয়ে হুকুম করল নদেরচাঁদকে মেরে ফেলতে কিন্তু মহুয়া ঐ ছুরী নিজের বুকে বসিয়ে দিল। বেদের দল খেপে উঠে নদেরচাঁদকে টুকরো টুকরো করে ফেলল কেটে।

নিজাম ডাকাত

ডাকাত নিজাম এ-পর্যন্ত মানুষ খুন করেছে বিস্তর। ফকির শেখ ফরিদের উপদেশে সে হয়ে পড়ল সাধু। ডাকাতি ছেড়ে একমনে সাধনা করে। ফকির তাঁর লাঠি নিজামকে দিয়ে বললেন, এই লাঠিটা মাটিতে পুঁতে দিয়ো, যেদিন দেখবে এতে কচিপাতা গজিয়েছে সেদিন জানবে তোমার সাধনার সিদ্ধি হয়েছে। কতদিন চলে গেল, কই সেই লাঠিতে তো কচিপাতা ধরল না।

একদিন এক দুর্বৃত্তকে নারীর অসম্মান করতে দেখে ক্রোধান্ধ নিজাম তাকে গিয়ে মেরে ফেলল। নিজের কাজে ক্ষুন্ন মনে এসে দেখে সেই নীরস লাঠিগাছি কচিপাতায় ভরে উঠেছে।

চন্দ্রাবতী

পূর্বে মনসামঙ্গলের কবি বংশীদাসের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এঁর মেয়ে চন্দ্রাবতী। তাঁর জীবন বড়ো দুঃখের। ফুলেশ্বরী নদীর ধারে পাকুদিয়া গ্রামে এঁদের বাস। এই গ্রামের একটি ছেলের নাম জয়চন্দ্র। ছেলেটি দেখতে শুনতে ভালো। শিশুকাল থেকে জয়চন্দ্র আর চন্দ্রাবতী এক সঙ্গে বড়ো হয়ে উঠেছেন খেলাধুলা করতে করতে। বড়ো হলে দুজনের মধ্যে ভাব হয়ে গেল, শেষে বিয়েরও কথাবার্তা স্থির। বিয়ের দিন জয়চন্দ্র এলেন না, খবর এল তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে একটি মুসলমানের সুশ্রী মেয়েকে বিয়ে করেছেন। চন্দ্রাবতীর মনে বড়ো লাগল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন জীবনে আর বিয়ে করবেন না। পূজা-অর্চা আর পিতার সেবা করে, পুঁথি লিখে দিন কাটাবেন। কিছুদিন পরে জয়চন্দ্র নিজের কাজে অনুতপ্ত হয়ে চন্দ্রাবতীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। চন্দ্রাবতী তখন শিবমন্দিরে তন্ময় হয়ে ধ্যানে

বসেছেন। জয়চন্দ্রের ডাক কানে পৌঁছল না। মন্দিরের দরজায় জয়চন্দ্র লিখে রেখে গেলেন—আমায় ক্ষমা কোরো। মন্দির থেকে বেরিয়ে আসার সময় সেই লেখা দেখে চন্দ্রাবতীর চোখ ফেটে এল জল। ধীরে ধীরে তিনি বাড়ি চলে গেলেন। চন্দ্রাবতী গিয়েছেন ফুল্লেশ্বরীতে জল আনতে, কাঁখে কলসী। দেখতে পেলেন জয়চন্দ্রের মৃতদেহ ভাসছে জলের ওপর। শোকে তিনি পাগলের মতো হয়ে গেলেন।

এখানে পূর্ববঙ্গের ছড়া থেকে একটু তুলে দিচ্ছি। কাঞ্চনমালা স্বামীকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। বিদেশে যাবার ছল করে তাঁর স্বামী এক রাজকন্যাকে বিয়ে করে তার কাছেই থাকলেন। স্বামীর আশায় ভেবে ভেবে আর কেঁদে কেঁদে অনেক দিন কেটে গেল কাঞ্চনমালার। শেষে সমস্ত খবর জানতে পেরে নিজে গিয়ে স্বচক্ষে স্বামীকে আর রাজকন্যাকে দেখে এলেন। তাঁর মন যেন শূন্য হয়ে গেল, তিনি গভীর রাতে নদীর ধারে এসে আপন মনে বলতে লাগলেন—

মনের দুঃক্ষু মিটিয়াছে মিটিয়াছে আশা
দেখিলাম বন্ধুর মুখ মনের ছিল আশা।
সুখেতে থাকো গো বন্ধু সুন্দর নারী লৈয়া,
সুখে করো গিরবাস জনম ভরিয়া।
না লইয়ো না লইয়ো বন্ধু কাঞ্চনমালার নাম,
তোমার চরণে আমার শতেক পরনাম।
এই না ঘাটেতে আছে পাতার বিছানা
সুখেতে রজনী দোয়ে করেছি বঞ্চনা।
মনে না রাখো রে বন্ধু সেই দিনের কথা
আর না রাখিয়ো মনে সেই মালা গাঁথা।
রাতের নিশি আনিগুনি তোমার বাঁশির গানে
অভাগিনীর কথা বন্ধুরে না রাখিয়ো মনে।

কানে কানে কইবে বাতাস কানাকানি কথা
তোমার কাছে কহিবাম যত মনের বেথা।
রাত্রিকালের সাক্ষী তুমি দিবাকালের সাক্ষী
কলংকিনীর কথা জানো দেশের পশু পংখী।
দেশের লোক নাই সে জানে আমার মরণকথা
কিজানি সে শুনিলে বন্ধু মনে পাবে বেথা।
কোন্‌দেশ হইতে আসিছে রে ঢেউ যাইবা কোথাকারে,
আমারে ভাসায়ে নেও দুস্তর সাগরে॥

তাব পর কাঞ্চনমালা জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

এইরকম লোকালয়ের চলিত-ঘটনায় ভরা এই গীতিকাগুলি যেমন স্পষ্ট, তেমনি মর্মস্পর্শী। রূপকথার প্রভাব অর্থাৎ অসম্ভব ঘটনা কতকগুলিতে আছে বটে। ছোটোবেলা থেকে দাদু-দিদার নামে প্রচলিত অসংখ্য গল্প যে ভাবে মন দখল করে থাকে তাতে ফলাও করে কিছু লিখতে গেলেই তাব প্রভাব এসে পড়ে। এ-সব ক্ষেত্রে ঘটেছে তাই।

প্রণয়কাহিনী নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে লেখা কবি সরূকের 'দামিনী চরিত্র' একখানি পুরানো ও বিশুদ্ধ গাথা-কবিতা। এর সঙ্গে উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত 'নীলার বারমাসি গান' আর সিলেটী নাগরী হরফে ছাপা খলিলের 'চন্দ্রমুখীর পুঁথি'-র নাম করতে হয়।

গীতিকা আর রূপকথা নানাভাবে সংগ্রহ করে এখন ছাপানো হচ্ছে। বিভিন্ন কালের রচনা বলে এগুলির কোনোটা প্রাচীন, কোনোটা আধুনিক।

এ দিকে দেখি বর্তমান যুগের প্রথম ভাগে ভারতচন্দ্রের লেখা একটু স্বতন্ত্র ধরণের হলেও সংস্কৃত ভাষার ও ভাবের হাত থেকে রেহাই পায় নি। পরবর্তীকালে ঈশ্বর গুপ্ত কবিতাতে একটা নতুন ধারা আনলেন। তাঁর কবিতা সরস আর নতুন ভঙ্গির বলে লোকের

কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর সময়কার কবিরা তাঁকে অনুসরণ করে লেখবার চেষ্টা করতেন। ঈশ্বর গুপ্ত ছোটো ছোটো বিষয়ের ওপর কবিতা লিখে গেছেন। সংবাদ-প্রভাকর নামে একখানি সাময়িক পত্রও চালিয়েছেন। এঁর মজার মজার কবিতা আছে, যেমন :

দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাত পোহানো ভার,
হল পুন্নিমেতে আমাবস্যা, তেরো পহর অন্ধকার।

আবার ইংরেজিশিক্ষিত তখনকার নব্যদের ঠাট্টা করে লিখেছেন—

. পায়ে দিয়ে বাঁকা বুট, দাঁতে কাটে বিসকুট,
গো টু হেল ড্যাম হুট্, মা বাপেরে বলেছে।
এর চেয়ে সুখোদয়, কবে আর কার হয়,
দেখো আর মহাশয় আশাতরু ফলেছে। ইত্যাদি

এই সময়ে রূপচাঁদপক্ষী নামে একজন কবিও হাসির গান রচনায় নাম করেন। তার একটা নমুনা : কৃষ্ণ আছেন মথুরায় রাজা হয়ে। বৃন্দা গেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। দেউড়িতে রাজার দারোয়ান তাঁকে আটকেছে। বৃন্দা তখন বলছেন—

লেট্ মি গো ওরে দ্বারী, আই ভিজিট টু বংশীধারী,
এসেছি ব্রজ হতে আমি ব্রজের ব্রজনারী।
বেগ ইউ ডোরকিপার লেট মি গেট
আই ওয়াণ্ট সি ব্লক হেড
ফর্ হুম আওয়ার রাধে ডেড্ আমি তারে সার্চ করি।
মরাল্ ক্যারেকটার গুন ওর, বাটার থিফ্ ননীচোর
ব্ল্যাগার্ড রাখাল পুওর চোর, মথুরার দণ্ডধারী।
রাখাল ভূপাল কপাল ভারি।

কহে আর্ সি ডি বার্ডকিং ব্ল্যাক ননসেন্স ভেরি কানিং
ফ্লুটেতে করে সিং মজায়েছে রাই কিশোরী
কুলনাশা বাঁশি করে করি ॥

রূপচাঁদপক্ষীর রচিত সেকেলে কলকাতার একটি উৎকৃষ্ট কৌতুকজনক বর্ণনাত্মক কবিতা পাওয়া যায়।

পরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছন্দে ও ভাবে কবিতাতে বাংলাভাষায় যুগান্তর আনলেন। তিনি রামায়ণের মেঘনাদবধের ঘটনা অবলম্বন করে যে কাব্য লিখলেন সেই কাব্য প্রকাশিত হবার পর দেশে একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল। কারণ আমাদের দেশে এ-পর্যন্ত সাহিত্যে যে ভাব আর যে ছন্দ চলে আসছিল, তা অধিকাংশ পুরোনো ধরণের। অর্থাৎ পয়ারের মতো ছন্দে আর সংস্কৃত কাব্যের আদর্শেই লেখা। মধুসূদন য়ুরোপীয় কাব্যের ভাব নিয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই কাব্য লেখেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে দু-একটা কবিতা যদিও কালী সিংহ লেখেন তবু মধুসূদনকেই এই ছন্দের প্রবর্তক বলা হয়। পয়ার কবিতার দুই দুই পংক্তির শেষের অক্ষরে মিল থাকে। অমিত্রাক্ষরে তা থাকে না। কিন্তু এই মিলনের অভাবটাই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান লক্ষণ নয়। মিত্রাক্ষরে প্রত্যেক পংক্তির শেষে একটি ক'রে পূর্ণ যতি থাকে; সুতরাং এক-এক পংক্তিতে এক-একটি ভাব প্রায় সমাপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দে পংক্তির অন্তে বা মধ্যে যে-কোনো স্থানে পূর্ণ যতি স্থাপিত হতে পারে; সুতরাং এক-একটি ভাব এক-একটি পংক্তিতে সমাপ্ত না হয়ে একাধিক পংক্তিতে প্রবাহিত হয়ে চলে। এটাই অমিত্রাক্ষর ছন্দের আসল লক্ষণ। তাই অমিত্রাক্ষর ছন্দকে পংক্তিলঙ্ঘক বা প্রবহমান পয়ার নামে অভিহিত করা যায়। এই নামটাই উক্ত ছন্দের মূল প্রকৃতির পরিচায়ক। দুটি উদাহরণ দিলেই এটা সহজে বোঝা যাবে। যথা—

মিত্রাক্ষর

সুরনদী ধারা বহে হিমাচল পুরে।
সেই তটে তপ করে মঙ্গল অসুরে।
ষট্ ঋতু সমান পবন মন্দগতি।
নিশি দিন তপ করে নাই অনুমতি।

অমিত্রাক্ষর

কহিলা সৌমিত্রি শূর শিরঃ নোয়াইয়া
ভ্রাতৃপদে, কেন আর ডরিব রাক্ষসে।
রঘুপতি, সুরনাথ সহায় যাহার
কী ভয় তাহার প্রভু এ ভবমণ্ডলে।

এইরকম লেখাকে কেউবা করল নিন্দে আর কেউবা করল প্রশংসা। সত্যকথা এই যে, যদিও মাইকেলের মেঘনাদবধকাব্যে অনেক দোষ আছে তবু বীররসের বর্ণনায় ও শব্দের আড়ম্বরে এই বইখানি এখনো অদ্বিতীয়।

মেঘনাদবধের ভাষা কঠিন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাই সবল ভাষায় মাইকেলের অনুকরণে বৃত্রসংহার কাব্য লিখলেন। কিন্তু কাব্যসৌন্দর্যের বিচারে সেখানি মেঘনাদবধ থেকে অনেক নিকৃষ্ট।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রভৃতি ছোটো বড়ো কাব্য লিখে যশোলাভ করে গেছেন। এর পরে নতুন নতুন কবিরা নতুন ভাবে নতুন ছন্দে বাংলাভাষা ভরে দিলেন। শেষে এই ভাষা এমন হয়ে দাঁড়াল যে জগতে একটি শ্রেষ্ঠ ভাষার মধ্যে গণ্য হল।

যাঁরা আজকাল কবিতা লিখে যশস্বী হয়েছেন আর মাতৃভাষাকেও সমৃদ্ধিশালিনী করেছেন তাঁদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এঁদের

কেউ কেউ নাটক উপন্যাস প্রভৃতিও লিখেছেন; কিন্তু কবিতাতেই এঁরা খ্যাত। আধুনিক কালে রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রখর আলোকে অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল সাহিত্যিক জ্যোতিষ্কগুলির দীপ্তি ম্লান বোধ হয় কিন্তু ভবিষ্যৎকালের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বোঝা যাবে এঁদের প্রতিভাও সামান্য নয়; রবিমণ্ডলভুক্ত হওয়াতেই তুলনায় অপেক্ষাকৃত ম্লান বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

রবীন্দ্র-যুগের প্রথমভাগে যাঁরা কবিখ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দ দাস ও রজনীকান্ত সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদ সেনের গান জনপ্রিয়।

রবীন্দ্র-যুগের মধ্যভাগে যাঁরা কবিযশের অংশীদার বলে গণ্য হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান। এঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ছন্দ-প্রতিভার জন্যে, তিনি অনেক নূতন ছন্দ উদ্ভাবন করে বঙ্গভারতীকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে বাংলাসাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তাঁর সহকর্মীরা এখনো বঙ্গবাণীর সেবায় নিরত আছেন। এই যুগের কবিদের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; উভয়ের রচনাতেই এক-একটি বিশিষ্ট সুর ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্র-যুগের শেষভাগে যাঁরা কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছেন, বর্তমান কালের নৈকট্য-বশত তাঁদের কবিপ্রতিভার যথোচিত মূল্য নির্ণয় এখন সম্ভব নয়, ভবিষ্যতের দূরত্ব থেকেই তা সম্ভব। তথাপি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আধুনিক কবিরা সংখ্যায়ও নগণ্য নন এবং তাঁদের সৃষ্টির প্রেরণাও বৈশিষ্ট্যহীন নয়। কিন্তু এস্থলে এঁদের রচনা-

বৈশিষ্ট্যের আংশিক আলোচনা করাও সম্ভব নয়। তবু গ্রন্থের পূর্ণতার খাতিরে কয়েকটিমাত্র নামের উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমথনাথ বিশী, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, অন্নদাশঙ্কর রায়, দিনেশ দাস, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অশোকবিজয় রাহা, হরপ্রসাদ মিত্র, সুশীল রায় প্রভৃতি অনেকেই নিজ নিজ বিশিষ্টতার জন্যে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। কাজি নজরুল ইসলামের কবিতায় অসাধারণ উদ্দীপনা পাঠকের মনে ফুটে ওঠে। এঁর গানগুলি জনপ্রিয়। জসিমউদ্দিন প্রভৃতি কবিগণের কাব্যে বাঙালির দেশের ও মনের অনিন্দ্যসুন্দর ছবিগুলি ভাষার গৌরবের সামগ্রী। বর্তমান যুগে কাহিনীকাব্যের পুনরাবির্ভাব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে; এ প্রসঙ্গে সুশীল রায়ের উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য।

এই কালে কাব্যোপন্যাস-রচনারও প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ একটা নতুন প্রচেষ্টা।

বাংলাকাব্যলক্ষ্মীর অর্চনায় বাংলার নারীরাও পিছিয়ে থাকেন নি। কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, প্রিয়ম্বদা দেবী, রাধারানী দেবী প্রমুখ মহিলা-কবিরা বাংলার সাহিত্যমন্দিরে যে দীপমালা জ্বেলেছেন তা পুরুষদের তুলনায় নিতান্ত নিষ্প্রভ নয়।

বাংলাকবিতার বই এখন যেমন বেড়ে চলেছে, তেমনি বাংলাছন্দের সংখ্যাও যাচ্ছে বেড়ে। তা ছাড়া গদ্যের মধ্যে পদ্যের রসভোগ করবার ঝোঁক অনেক কাল আগে থেকেই কবিদের ছিল। যার ফলে সংস্কৃত-ভাষায় 'বৃত্তগন্ধি' গদ্যের উৎপত্তি। 'বৃত্তগন্ধি' মানে যাতে কবিতার ছন্দের গন্ধ পাওয়া যায়।

বাংলাভাষার গদ্যছন্দের প্রচলন রবীন্দ্রনাথ করে গেছেন। য়ুরোপীয় ভাষায় অবশ্য অনেকদিন থেকে পদ্যজাতের গদ্য আছে। একটা কথা কিন্তু অবশ্য মনে রাখা চাই যে, যে কোনো গদ্যকে কেটে কেটে পদ্যের

মতো করে সাজালেই গদ্যছন্দ হয় না। এতে রীতিমত মাত্রার মাপ, আর চলন-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য আছে। বিশেষত এই গদ্যছন্দ নতুন বলে অনেকেই ঠিকমত পড়তে অভ্যস্ত নন। আবার কবি যদি ছন্দে পাকা না হন তবে লিখতেও গোলমাল করে ফেলেন। অনেক ক্ষেত্রে ঘটেও তাই। রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দের উদাহরণ:

একদিন আষাঢ়ে নামল
বাঁশবনের মর্মরঝরা ডালে
জলভারে অভিভূত নীলমেঘের নিবিড় ছায়া।
শুরু হল ফসলখেতের জাবনীরচনা
মাঠে মাঠে কচিধানের চিকন অঙ্কুরে
এমন সে প্রচুর, এমন সে পরিপূর্ণ, এমন প্রোৎফুল্ল,
দ্যুলোকে ভূলোকে বাতাসে আলোকে
তার পরিচয় এমন উদার প্রসারিত—
মনে হয় না সময়ের ছোটো বেড়ার মধ্যে
তাকে কুলাতে পারে,
তার অপরিমেয় শ্যামলতায়
আছে যেন অসীমের চির-উৎসাহ,
যেমন আছে তরঙ্গ-উল্লোল সমুদ্রে॥

যাত্রা থিয়েটার ও অপেরা

আমাদের ভাষায় প্রাচীন নাটকের যা খবর পাওয়া যায় তার সংখ্যা বেশি নয়। রামায়ণ, মহাভারত অথবা কোনো পৌরাণিক বইয়ের ঘটনা অবলম্বন করে অভিনয় করা হত। পরে ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয়ের অভিনয় চলে।

এখানে একটা কথা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, যারা অভিনয় করে তাদের বলা হয় কুশীলব। এই কথাটা আধুনিক লেখকগণও ব্যবহার করেছেন। এই কুশীলব শব্দটি থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচীনকালে একজন কুশ আর একজন লব সেজে রামায়ণের পালা ভাবভঙ্গির সঙ্গে গাইত। সেই ভাবভঙ্গির সঙ্গে গানই ক্রমে ক্রমে অভিনয়ে পরিণত হয়েছে। আর অভিনেতাদের নাম সেই হতে কুশীলবই থেকে গেছে।

নেপালের রাজার পুস্তকালয়ে খানচারপাচ বাংলা পুরানো নাটক পাওয়া গেছে, এ কথা আগে বলা হয়েছে। এই নাটকগুলিতে গদ্যে কথাবার্তা প্রায় নেই। ছোটো ছোটো গানে উক্তি-প্রত্যুক্তি রয়েছে।

সেকালে ছাপানোর যন্ত্র না থাকায় প্রোগ্রাম ছিল না। কাজেই লোকের বুঝবার সুবিধার জন্যে যারা অভিনয় করত তারা নিজের পরিচয় নিজেই অথবা অন্যকে দিয়ে দিত। এই রীতি উড়িষ্যার কোনো কোনো জায়গায় যাত্রার অভিনয়ে এখনো প্রচলিত রয়েছে। যেমন—বিরাট রাজা আসরে এলেন, এসেই তিনি গান ধরলেন :

বিরাট নৃপতি হয়ে অমর সমান,
সুদর্শনা পিয়া মোর রতিসম জান।
সচিব নীতিবর্মা বিচারয় জান। ইত্যাদি।

পরবর্তী কালে পরিচয় দেওয়ার রীতি উঠে যায়।

অভিনয়ে সাধারণ লোক মেতে ওঠে, কাজেই নানা জেলা থেকে কৃষ্ণযাত্রার দল দেখা দেয়। কেননা কৃষ্ণচরিত্রের মধ্য দিয়ে সবরকম ভাবেরই অভিনয় করা চলে। এই-সব অভিনয়ের দলের অর্থাৎ নাটুকে দলের মালিককে অধিকারী আর অভিনয়কে বলা হয় যাত্রা-অভিনয়।

যাত্রা মানে যাওয়া। উৎসবে নানালোক যেয়ে জড়ো হত অথবা

দেবতা বাইরে যেতেন। তার থেকে উৎসবের নাম হয়ে দাঁড়াল শোভাযাত্রা করে যাওয়া বা যাত্রা। যেমন রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি। এখন এই-সব যাত্রা উপলক্ষে সাধারণ লোককে আমোদ দেবার জন্যে অভিনয়ের অনুষ্ঠান করানো হত। ক্রমে ক্রমে এই অভিনয়েরই নাম হয়ে গেল যাত্রা।

য়ুরোপীয় ধরণে স্টেজ বেঁধে সিন্ খাটিয়ে অভিনয় করাকে বলে থিয়েটার। আর যে অভিনয়ে খালি নাচগানই বেশি তা হল অপেরা, বাংলায় বলে গীতিনাট্য। গীতিনাট্য, স্টেজে আর খোলা জায়গায়, উভয়ত্রই অভিনীত হতে পারে। গীতিনাট্যের ভেতর হাসিখুশি ও রঙ্গরহস্যের অধিকারই বেশি বলে মনে হয়।

একশো বছর আগে এইচ. লেবেডফ নামে একজন রাশিয়ান সব-প্রথম থিয়েটার আরম্ভ করেন কলকাতায়। থিয়েটারের নতুনত্বে বড়ো বড়ো লোক মেতে উঠলেন। কিন্তু যাত্রার অভিনয় হয় খোলা জায়গায়। আর থিয়েটারের অভিনয় হয় বাঁধা স্টেজে কাজেই একরকম বই দুই কাজে চালানো যায় না। সেজন্যে দরকার হল থিয়েটারের যোগ্য নতুন ধরণের বই লেখার। প্রথম প্রথম সংস্কৃতনাটকের থেকে অনুবাদ করে কাজ চালানো হল। কিন্তু তাতে থিয়েটার তেমন জমল না, পরে পুরস্কার ঘোষণা করে বই লিখিয়ে নেবার ব্যবস্থা হয়। এতে অগ্রণী ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বাবুরা। লেখকদের মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্ন পুরস্কার পান—কুলীনকুলসর্বস্ব নামে নাটক লিখে। সেই নাটকের অভিনয়ও হয়। এই-সব নাটক সংস্কৃত ছাঁচে ঢালা আর এগুলির ভাষাও তত মনোরঞ্জক নয়। তবু সেই অভাবের যুগে তা বেশ খ্যাতি লাভ করেছিল। কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক লিখে নাট্যকার অর্থ ও যশ দুইই লাভ করেন। এই নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ সালে। নাটক লিখে তিনি সেকালে এতটাই জনচিত্ত জয়

করেছিলেন যে, 'নাটুকে নারান' নামেই তিনি পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন। অনেকগুলি নাটক ইনি রচনা করেছেন, এর মধ্যে সমাজচিত্রঘটিত নক্‌শা জাতীয় নাটক, পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে লিখিত নাটক, প্রচলিত আখ্যায়িকাঘটিত নাটক, এবং সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ আছে।

রামনারায়ণের নাটক যখন খুবই জনপ্রিয়, সেই সময়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত রামনারায়ণ কর্তৃক অনুসৃত প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের নিয়মবদ্ধ রীতি ত্যাগ করে নূতন পদ্ধতিতে নাটক রচনা করেন। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা ও কৃষ্ণকুমারী বাংলা নাটকের নূতন পথ প্রদর্শন করে। মধুসূদন মহাকবি রূপেই পরিচিত বটে, কিন্তু নাটক-রচনার দ্বারাও তিনি তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। মধুসূদন কর্তৃক রচিত অন্যান্য নাটক ও প্রহসন—পদ্মাবতী, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথমটা সংস্কৃতের অনুসরণ করেন, কিন্তু পরে বাংলা নাটকে বিলাতী আদর্শ চালান। এগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

তার পর নানাজনের চেষ্টায় থিয়েটার ক্রমে জাঁকিয়ে ওঠে। এই থিয়েটারকে অবলম্বন করে বইও রচিত হয়েছে বিস্তর।

বাংলানাটক যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দীনবন্ধু মিত্র অভিনয়ের বিষয়ে বিশেষ পরিবর্তন এনে দেশে একটা উৎসাহের সঞ্চার করে দেন।

মধুসূদন নাট্যরচনার যে নূতন পথ উদ্ভাবন করেন সেই পথে অগ্রসর হয়ে নূতন নাটক রচনার চেষ্টা এই সময়ে দেখা দেয়। এই ভাবে যাঁরা চেষ্টা করেন তাঁদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে তখন দেশের লোক অতিষ্ঠ। দীনবন্ধু মিত্র এই ঘটনা নিয়ে রচনা করলেন নীলদর্পণ নাটক। এই নাটক প্রকাশিত

হওয়া মাত্র বাংলাদেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। একটি মাত্র বই দেশের লোকের মনে এমন ব্যাকুলতা জাগাতে পারে, এ ধারণা এর আগে কারও ছিল না। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, মধুসূদন দত্ত এই নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। নীলদর্পণের এই ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করায় লং সাহেবের জেল হয়।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এ-পর্যন্ত যত নাট্যকার হয়েছেন তার মধ্যে অনেকে গিরিশচন্দ্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। তিনি একাধারে নাট্যকার ও অভিনেতা ছিলেন। তাঁর অভিনয়দক্ষতা থেকেই নাট্যরচনার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। অভিনেতা হিসাবে যখন তাঁর খ্যাতি বেশ ছড়িয়ে পড়েছে, সেই সময়ে অভিনয়ের উপযোগী নাটক রচনার দিকে তিনি মনোযোগ দেন। এবং প্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার নাট্যরূপ দেন। গিরিশচন্দ্র বহুবিধ নাটক রচনা করেছেন, এবং তাঁর রচিত নাটকের সংখ্যাও অনেক— এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— জনা, পাণ্ডবগৌরব, বলিদান, দক্ষযজ্ঞ, প্রফুল্ল প্রভৃতি। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় গিরিশচন্দ্র বিশেষ শ্রম করেন। নাটকেও ইনি অনেক নূতনত্ব প্রবর্তন করেন।

অমৃতলাল বসু গিরিশচন্দ্রেরই মতো রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। গিরিশচন্দ্র যেমন নাটকে নূতনত্বের সঞ্চার করেন, অমৃতলাল তেমনি নূতনত্ব আনেন প্রহসন-রচনায় এবং বিদ্রূপাত্মক নাটিকায়। রস-রচনায় অমৃতলাল খুব দক্ষ ছিলেন। এইজন্য 'রসরাজ' নামে তিনি অভিহিত হন। অমৃতলাল অনেকগুলি প্রহসনাদি রচনা করেন, তার মধ্যে চোরের উপর বাটপাড়ি, চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে, কৃপণের ধন, ব্যাপিকাবিদায় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একাধারে কবি ও নাট্যকার। কিন্তু নাট্যকার রূপেই

তাঁর পরিচয় বেশি। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক দেশবাসীর মনে স্বদেশীভাব জাগিয়ে তোলে; এঁর রচিত অনেক স্বদেশী গানও লোকের মুখে মুখে এককালে সর্বত্র শোনা যেত। এঁর হাসির গান ও প্রহসনও একসময়ে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে ইনি দুইটি নাটক রচনা করেন— পাষাণী ও সীতা। তার পর রচনা আরম্ভ করেন ঐতিহাসিক উপাদান নিয়ে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দুর্গাদাস, মেবারপতন, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি। তিনি সামাজিক ঘটনা নিয়ে নাটক লেখেন, যেমন— পরপারে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটক বাংলা দেশে একসময়ে খুবই জনপ্রিয় ছিল। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে যেমন নাটক রচনা করেছেন, তেমনি পৌরাণিক উপাখ্যান নিয়েও নাটক লিখেছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকগুলির মধ্যে আলিবাবা খুবই নাম করেছিল। এই নাটকের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি আরও অনেকগুলি নাটক রচনা করেন— জুলিয়া, আলাদিন, বাদসাজাদী, কিন্নরী প্রভৃতি। এ ছাড়া কয়েকটি পৌরাণিক নাটকও তিনি রচনা করেন— বভ্রুবাহন, সাবিত্রী, উলুপী, নরনারায়ণ। বৌদ্ধ যুগের ও ইতিহাসের কাহিনী নিয়েও ক্ষীরোদপ্রসাদের অনেকগুলি নাটক আছে।

অন্যান্য যশস্বী নাট্যকারদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমানকালে মন্মথ রায়, প্রমথনাথ বিশী, বনাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত যশস্বী নাট্যকার বলে খ্যাতিলাভ করেছেন। থিয়েটারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লেখকেরা যেমন অসংখ্য বই রচনা করে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে ভরিয়ে তুলেছেন, তেমনি আবার যাত্রার উপযুক্ত বইও অনেকে লিখেছেন। সেগুলির সংখ্যা নেহাত কম নয়। বাংলাদেশের সর্বত্রই যাত্রাভিনয়ের মধ্যে দিয়ে ঐ-সব রচনা লোকের মনে আজও অজস্র রস সঞ্চার করে যাচ্ছে। এই ধরণের সাহিত্যলেখকদের মধ্যে অঘোর

কাব্যতীর্থ, ধনকৃষ্ণ সেন, ধর্মদাস রায়, নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি রচনাতে খ্যাতিলাভ করেছেন।

দুঃখের বিষয় কাব্য উপন্যাস ইত্যাদিতে বাংলার আধুনিক লেখকেরা যেরকম শক্তি দেখাচ্ছেন নাটকে তা পারছেন না। নাটকীয় প্রতিভা ক্রমেই বাংলাসাহিত্য থেকে লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে।

উপন্যাস ও গল্প

বর্তমানে উপন্যাসই বাংলাসাহিত্যের প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। যত বই প্রতিবছর বাংলা-ভাষাতে বেরুচ্ছে, তার ফর্দের দিকে তাকালেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ-দেড়েক বছর আগেও বাংলাসাহিত্যে গদ্যের তেমন চলন ছিল না। এই অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা গদ্যের কী রকম শ্রী ফিরে গেছে তা আলোচনা করলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

মিশনারীদের আমলে তৈরি পাঠ্যপুস্তকগুলিতে গল্পগুজব থাকলেও তা উপন্যাস বা গল্প শ্রেণীতে গণ্য হতে পারে না। এর একটা প্রধান কারণ এই সেগুলির উদ্দেশ্য শিক্ষা দেওয়া; আর উপন্যাস ও গল্পের উদ্দেশ্য পাঠককে আনন্দ দেওয়া। প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালের ঘরের দুলাল, কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নক্সা, প্রভৃতি দু-একখানা বইকে আধুনিক বাংলা উপন্যাস ও গল্পের আদিরূপ বলে ধরা যেতে পারে। এ ছাড়া বিজয়বসন্ত, মৎস্যনারীর উপাখ্যান, গোলেবকাওয়ালী, রবিন্সনক্রুশো, বঙ্গাধিপ-পরাজয় প্রভৃতি খানকতক বই সেকালে প্রচলিত ছিল।

পরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অসামান্য প্রতিভাবলে বাংলা-উপন্যাস

আরোহণ করল উন্নতির চরম সোপানে। বঙ্কিমবাবু বাংলা উপন্যাস ও প্রবন্ধে নতুন প্রাণ-সঞ্চার করে দিলেন। তাঁর সাহিত্যিক শিষ্যপ্রশিষ্যদের হাতে আজ পর্যন্ত বাংলাসাহিত্য, রূপান্তর গ্রহণ করতে করতে এগিয়ে চলেছে। অবশ্য এই যুগে য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব বাংলাসাহিত্যে পড়ে। সেই প্রভাবে বাংলাসাহিত্য সতেজ ও সবল হয়ে উঠেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাসাহিত্যের বিভিন্ন দিকে তাঁর লেখনী চালনা করেন। কখনো তিনি শিল্পী, কখনো সমাজসংস্কারক, কখনো কর্মযোগী, কখনো বা স্বাদেশিকতার উদ্ভাবক হিসাবে নিজের পরিচয় তিনি দেন। তাঁর আনন্দমঠের বন্দেমাতরম্ সংগীতটি বর্তমানে সর্বভারতে সাদরে গৃহীত হয়েছে। অন্যান্য উপন্যাস হচ্ছে— বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, রাধারাণী, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত উপন্যাসের মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস যেমন আছে তেমনি সামাজিক উপন্যাসও আছে। কিন্তু ঐতিহাসিকই হোক বা সমাজবিষয়কই হোক সর্বত্রই কাহিনীগুলি রচিত হয়েছে এমন ভাবে যে, সেগুলি পুরোপুরিভাবে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধরচনার দ্বারাও বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধন করেছেন— এ বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হল।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবর্তী কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন প্রথমে ইংরেজিতেই রচনা আরম্ভ করেন রমেশচন্দ্র দত্তেরও সাহিত্যসাধনার আরম্ভ ইংরেজি রচনার দ্বারা। কিন্তু তাঁকে বাংলা ভাষায় সাহিত্যসাধনার প্রেরণা দেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁরই ফলে রমেশচন্দ্র অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন— বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত, রাজপুত জীবনসন্ধ্যা প্রভৃতি উপন্যাস। তাঁর একটি মহৎ কাজ হচ্ছে বাংলাভাষায় ঋগ্বেদসংহিতার অনুবাদ।

সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তাঁর ভ্রমণকাহিনী পালামৌ। তাঁদের রচিত উপন্যাসগুলি আধুনিক কালেও রস-মাধুর্য হারায় নি, এখনও ওগুলি পাঠ করে যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায়। এ সময় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতা (উপন্যাস) ও দুর্গাচরণ রায়ের দেবগণের মর্ত্তে আগমন (ভ্রমণকাহিনী) নামে বই দুখানি পাঠকসমাজের প্রশংসা লাভ করে। মোশারফ হোসেনের বিষাদসিন্ধু ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করে লেখা হলেও রচনাগুণে কাব্যধর্মী। এ জন্য জনপ্রিয়। যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে নবযুগের সৃষ্টি করেছেন। এ দুজনের কথা পরে বলা যাবে। কথা-সাহিত্যের এই নূতন পর্যায়ে যাঁরা বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, জলধর সেন, প্রমথ চৌধুরী, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নাম বলা উচিত। প্রভাতকুমারের ছোটো গল্পগুলি আমাদের সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ বলে গণ্য হয়েছে। প্রভাতকুমারের প্রথম-প্রকাশিত বই হচ্ছে গল্পগ্রন্থ, নাম নবকথা। ইনি বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে যান, তার আগে এই বই বের হয়। দ্বিতীয় গল্পের বই ষোড়শী। তার পর একে একে প্রকাশিত হয় গল্পাঞ্জলি, গল্পবীথি, পত্রপুষ্প, গহনার বাক্স ইত্যাদি। গল্পরচনার সঙ্গেসঙ্গেই তিনি উপন্যাস রচনায়ও হাত দেন। অনেকে মনে করেন, তাঁর লামাকুমারী উপন্যাসের কাহিনী তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পান। তাঁর রচিত কয়েকটি উপন্যাস হচ্ছে— নবীন সন্ন্যাসী, রত্নদীপ, আরতি, সুখের মিলন, রমাসুন্দরী। তাঁর রচিত উপন্যাসে বা গল্পে তিনি যে-সব উপাদান ব্যবহার করেছেন তা প্রায় সবই পরিচিত জীবন থেকেই সংগ্রহ করা। বাংলা ছোটোগল্পে প্রভাতকুমার বিশিষ্ট একটি স্থানের অধিকারী। এই যুগের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামও স্মরণীয়। বর্তমান কালে কথা-সাহিত্য রচনা করে যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী, সুবোধ ঘোষ, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষ, যাযাবর, রমাপদ চৌধুরী, সুশীল রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকবৃন্দ নিজ নিজ বিশিষ্টতার দ্বারা পাঠক-পাঠিকার চিত্ত বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছেন। দেশ ও সমাজের অনেক বিষয় যা আমাদের এতদিন চোখ এড়িয়ে উপেক্ষিত হয়ে এসেছিল এঁদের অনেকের রচনার প্রভাবে সেগুলির উপর পাঠকের দরদী দৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে। এঁরা নিজ নিজ রচনার দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যভাণ্ডারকে বিচিত্র সম্পদের অধিকারী করে তুলছেন। এঁদের রচিত সাহিত্যের মূল্য নির্ণয় করা বর্তমান কালের কাজ নয়।

চলতি নদীর স্রোতের ওপরে থেকে যেমন সমগ্র নদীটার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না, তেমনি কোনো লেখকের পক্ষেই সমসাময়িক সাহিত্যের যথার্থ বিচার করা সম্ভবপর নয়।

কথা-সাহিত্যের ভাণ্ডারে বাঙালি নারীর দানও আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীই এ বিষয়ের পথপ্রদর্শক এবং তাঁর রচনাবলী রসগ্রাহীদের কাছে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। তার পরে যাঁরা গল্প উপন্যাস রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, শান্তা দেবী, সীতা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, প্রভাবতী দেবী আশালতা দেবী ও আশাপূর্ণা দেবীর নাম সাদরে উল্লেখযোগ্য।

এ কথা অবশ্য মনে রাখতে হবে— উপন্যাস আর গোয়েন্দাকাহিনী অর্থাৎ ডিটেক্‌টিভের গল্প, আরো অনেক কিছুর মতো বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে।

রঙ্গরচনা

যা পড়লে মনটা বেশ হাস্যময় আনন্দে ভরে ওঠে তাই রঙ্গ-রচনা। শুধু লোক হাসবার জন্যে সুরুচি কুরুচি ভেদাভেদ না রেখে যা-তা লেখা রঙ্গ-রচনা নয়। পুরোনো বাংলায় যে-সব রঙ্গ-রচনা আছে প্রায়ই তা একটু মোটা রকমের। অর্থাৎ ভালোয় মন্দয় মিশানো।

দাশরথি রায়ের রচনাতে অনেক হাস্যরস আছে। অন্যান্য পাঁচালী বা কবিওয়ালাদের লেখাতেও রঙ্গরচনা আছে। কিন্তু সেগুলি নিছক রঙ্গের জন্য নয়। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু অনেক হাস্যরসের বই লিখেছেন। তার পর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু (পরশুরাম), রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, প্রমথনাথ বিশী, অমূল্যকুমার দাশগুপ্ত (সম্বুদ্ধ) শ্রেষ্ঠ রঙ্গরচনাকার। এঁদের রচনা যেমন সুখপাঠ্য, তেমনি আনন্দদায়ক।

গল্প উপন্যাস লেখার চেয়ে রঙ্গরচনা ঢের কঠিন। সকলে লিখতে পারে না। জোর করে হাস্যরস সৃষ্টি করতে গেলে রচনা অত্যন্ত নিকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এই রচনা মনকে যথেষ্ট হালকা করে দেয় বলে পাঠক ভারী স্বস্তি লাভ করে। কাজেই রঙ্গরচনা সকলেই পছন্দ করে। দুঃখের বিষয় বাংলায় অন্য বিষয়ের তুলনায় এই জাতীয় রচনা যৎসামান্য।

কাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত কাব্যক্ষেত্রে যুগান্তরের সূত্রপাত করেন বলা যায়। তিনি তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচনা করে বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেন। এবং তার পরে মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করে তাঁর প্রবর্তিত এই নবীন ছন্দের প্রাণময়তার নিদর্শন দেন।

মেঘনাদবধ কাব্য সে সময়ে কাব্যক্ষেত্রে খুবই আলোড়নের সৃষ্টি করে। বাংলা ভাষায় রচিত মহাকাব্য সম্ভবত এই প্রথম। এর পরে মধুসূদনের অনুসরণে মহাকাব্য রচনার জন্য অনেকেই উৎসাহিত হন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেন।

হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম চিন্তাতরঙ্গিণী। এই গ্রন্থ রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। এর পরেই তিনি রচনা করেন বীরবাহু কাব্য, স্বদেশপ্রীতিই এই কাব্যের মুখ্য বিষয়। হেমচন্দ্রের সর্বপ্রধান কাব্য বৃত্রসংহার। এই কাব্য রচনা করেই তিনি যশস্বী হয়েছেন। এটিকে তিনি মহাকাব্য বলে প্রচার করেন নি বটে, কিন্তু মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের অণুপ্রেরণাতেই এই গ্রন্থ রচিত, এই কারণে বৃত্রসংহারকে অনেকে মহাকাব্য বলে উল্লেখ করে থাকেন। বৃত্রসংহারের কাঠামোটি পৌরাণিক, কিন্তু এতে ইংরেজি কাব্যেরও কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই দীর্ঘ কাব্যটি রচনার পর হেমচন্দ্র আরও যে দুটি কাব্য রচনা করেন তার সুর তাঁর প্রথম কাব্য চিন্তাতরঙ্গিণীর মতোই। এইজন্যই মনে হয়, হেমচন্দ্রের লেখনী খণ্ডকাব্য রচনারই উপযোগী।

হেমচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ কিন্তু কাব্যক্ষেত্রে তাঁরই সমসাময়িক হচ্ছেন নবীনচন্দ্র। নবীনচন্দ্রের প্রথম কাব্য অবকাশরঞ্জিনী। ইনিও দীর্ঘ

কাব্যরচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে লেখেন পলাশীর যুদ্ধ। নবীনচন্দ্র যে খ্যাতি লাভ করেছেন তা সম্ভবত এই কাব্যের জন্যই। বাংলাদেশের বা ভারতবর্ষের ইতিহাসে পলাশীর প্রান্তরের যুদ্ধটি একটি বৃহৎ ঘটনা। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত এই কাব্যটি। এইজন্যেই এই কাব্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং এক সময়ে সকলে কাব্যটি কণ্ঠস্থও করেন। এ কাব্যেও দেশপ্রীতি মুখ্য বিষয়। পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে ইংরেজ কবি বায়রনের অনেক প্রভাব আছে। এই কাব্যরচনার পর নবীনচন্দ্র রচনা করেন ক্লিওপেট্রা ও রঙ্গমতী। শেষোক্ত গ্রন্থ-দুটি তেমন জনপ্রিয় হয় নি।

বাংলা কাব্যে এইরূপ সুর তখন চলেছে। এর মধ্যে আবির্ভাব ঘটল বিহারীলাল চক্রবর্তীর। বাংলা কাব্যে তিনি নূতন সুর আনলেন। বিহারীলালের দ্বারাই বাংলাদেশে নূতন কবিতার সূত্রপাত ঘটল। তাঁর কাব্য অন্তরঙ্গ, এবং এতে কবির ব্যক্তিত্বের প্রকাশও সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। বিহারীলালকে অনেকে বলেন বাংলাসাহিত্যের ভোরের পাখি। অর্থাৎ সাহিত্যক্ষেত্রে যে নূতন দিন আসছে বিহারীলালের কণ্ঠধ্বনিতেই তার আভাস পাওয়া যায়। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য সারদামঙ্গল। যে গীতিকবিতার ধ্বনি মহাকাব্যের ধ্বনির মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, বিহারীলাল তাঁর স্বকীয় আবেগপূর্ণ ভাষায় ও ভাবে তা উদ্ধার করে আনলেন বলা যায়।

প্রবন্ধ

বাংলাসাহিত্যের প্রবন্ধ একটা বিশেষ সম্পদ। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মনীষিগণ এত ভালো ভালো প্রবন্ধ লিখেছেন যে তার সম্পূর্ণ বর্ণনা করা সহজ নয়। তবে যাঁদের বই সকলের কাছে আদর পাচ্ছে তাঁদের

নামের তালিকার প্রতি লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, বাংলাসাহিত্যের এই বিভাগটি নিঃসম্পদ নয়। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রমুখ মনীষীরা ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজ প্রভৃতি বহু বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার সূচনা করেন। তাঁদের প্রবন্ধসম্ভারে আধুনিক বাংলাসাহিত্যের প্রথম যুগে বাঙালির চিত্ত বহু বিচিত্র বিষয়ের চিন্তায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এই মনীষিসংঘের মধ্যমণি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁরই বলিষ্ঠ মনের চিন্তা এবং সরস ও সবল রচনার স্পর্শে বাংলাদেশের জনচিত্তে স্বাদেশিকতা ও স্বাজাতিকতার উদ্‌বোধন ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে যাঁরা বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের উন্নতি সাধন করেন তাঁদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কেশবচন্দ্র সেন, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদয়াল মজুমদার প্রভৃতি বিশেষভাবে স্মরণীয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার বাংলায় ঐতিহাসিক চর্চার একনিষ্ঠ সাধকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর দার্শনিক রচনার অন্যতম প্রথম প্রবর্তক বলে খ্যাত হয়েছেন। প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে জ্ঞানব্রতী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যে অনন্যতা অর্জন করেছেন তার সম্যক্ আলোচনার স্থান এটা নয়। তবে এটুকু বলা প্রয়োজন যে তাঁর লেখনীর স্পর্শে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বহু বিভাগই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। তাঁর সরস ও সবল অথচ অতি সরল রচনাভঙ্গির গুণে দর্শন-বিজ্ঞানের দুরূহতম তত্ত্বগুলিও অবলীলাক্রমে সাধারণ পাঠকেরও অনায়াসবোধ্য হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন প্রবন্ধ-সাহিত্যের আসরে সগৌরবে আবির্ভূত হলেন তখন থেকেই বাংলায় এক স্বর্ণযুগের উদ্‌বোধন ঘটল। কত বিচিত্র যে তাঁর বিষয়বস্তু, কত অজস্র তাঁর গদ্যরচনার ধারা ও কত অপরূপ তাঁর প্রকাশভঙ্গি,

তা এই সামান্য পুস্তকে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের অলোক-সামান্য কবিপ্রতিভাই আমাদের হৃদয়কে মুগ্ধ করে রেখেছে, তাই তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্যের যথোচিত মর্যাদা অজ্ঞাত। কিন্তু বস্তুত তাঁর প্রবন্ধাবলির যথার্থ গৌরব তাঁর কাব্য-সাহিত্যের চেয়ে ন্যূন নয়। তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক বললেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। বাংলার আধুনিক শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিকদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। চলতি ভাষাকে সাহিত্যের বাহন করবার পক্ষে প্রমথবাবু আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন। এই আন্দোলন তিনি চালিয়েছিলেন 'সবুজপত্র' নামে সুবিখ্যাত সাহিত্য-পত্রে। তাঁর ঐ আন্দোলনের ফলে অনেকেই চলতি ভাষাকে সাহিত্যের বাহন বলে স্বীকার করেছেন। এটাই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের বিশেষ কৃতিত্ব ও সাফল্য। বর্তমানে সমালোচনা-ক্ষেত্রে সজনীকান্ত দাসের নাম বহুবিশ্রুত।

শিশুসাহিত্য

বয়স্ক লোকের মনের খোরাক জোগানোর লোকের অভাব নেই। কিন্তু ছোটো ছোটো ছেলেদের মনের খোরাক জোগানোর লোক কম। কাজটাও সোজা নয়। পাঁচ বছর থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত ছেলেদের মন বছরে বছরে বদলে যায়। কাজেই পাঁচ বছরের ছেলের যে ধরণের বই চাই সাত বছরের ছেলের জন্য তাতে হয় না, অন্য ধরণের বই দরকার।

বয়স আর বুদ্ধির ক্রম-অনুসারে ছেলেদের জন্য বই লেখা বেশ কঠিন কাজ। কিছুকাল আগে তো শিশুদের বইই ছিল না। গত ত্রিশ চল্লিশ বছর থেকে শিশুসাহিত্য দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। আশা

করা যায় ভবিষ্যতে আরও বাড়বে, আরও সুন্দর হবে ও যথাযোগ্যভাবে বাংলাভাষাকে উজ্জ্বল করে তুলবে।

শিশুসাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, সুকুমার রায়, জগদানন্দ রায় শিশুদের জন্যে বিবিধ বিষয়ে ও বৈজ্ঞানিক বই লিখে বাংলাসাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। কুলদারঞ্জন রায় ও সুখলতা রাও, সুনির্মল বসু, সুবিনয় রায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এ বিষয়ে।

বর্তমানে অন্যান্য লেখকদেরও লেখা শিশুপাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে উঠেছে। তবে সবাই যে উৎকৃষ্টতা লাভ করছে তা নয়।

অনুবাদ-সাহিত্য

সাহিত্যের নানা দিকের মধ্যে অনুবাদেরও স্থান বড়ো। কেউ কেউ মনে করেন অনুবাদের দ্বারা সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করা দরিদ্রতার লক্ষণ। এ কথা কিন্তু ঠিক নয়। কেননা অন্যান্য দেশের মনীষীদের চিন্তা অনুবাদের ভিতর দিয়ে ঘরোয়া হয়ে ওঠে। নিজের ভাষার ভিতর দিয়ে যদি অন্য ভাষার সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তবে সেটা গৌরবেরই কথা। অবশ্য কাব্য কবিতার রস অনুবাদে ঠিকমত ধরা পড়ে না; কিন্তু দেশ সমাজ আচার বিচার বিজ্ঞানের নানা শাখা চিকিৎসা গণিত প্রভৃতি বিষয়ের অনুবাদে কিছু হানি ঘটে না, বরঞ্চ বিভিন্ন বিষয়ের অনুবাদে নতুন নতুন শব্দগঠনের দ্বারা ভাষার শব্দসম্পদ বাড়ে আর দেশের অনেক লোকে রুচিমত তা পড়তেও পারে। দেখা যাচ্ছে ইংরাজি অনুবাদের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর হেন দেশের হেন বিষয় নেই যা জানা না যায়। অথচ এই অনুবাদ-বিপুলতার জন্যে ইংরেজির নিজস্ব গৌরব কিছুমাত্র কমে নি।

বাংলা ভাষায় অনুবাদ-সাহিত্য অতি অকিঞ্চিৎকর। বিদেশি বইয়ের তো কথাই নেই। এই ভারতবর্ষেরই অন্য প্রদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিকের ভালো ভালো বইয়েরও বাংলা অনুবাদ নেই। তাদের খবরও আমরা জানি নে। এটা আমাদের এক দিক দিয়ে দুর্বলতার লক্ষণ।

অনেকগুলি হিন্দু মুসলমান ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। খ্রীস্টান ধর্মগ্রন্থের ভালো অনুবাদ বেশি নেই। বিদেশী গল্প উপন্যাস কাব্য দর্শন প্রভৃতির কিছু কিছু অনুবাদ হচ্ছে। কোনো একটি সমবেত চেষ্টা দ্বারা ভালো অনুবাদক দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত নামকরা বইগুলির বাংলা অনুবাদ হওয়া একান্ত কর্তব্য। বর্তমানে একটু একটু করে হচ্ছে।

বাংলাতে সবচেয়ে বেশি অনুবাদ হয়েছে সংস্কৃত বইয়ের। এজন্য পঞ্চানন তর্করত্ন, দুর্গাচরণ বেদান্ততীর্থ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ প্রমুখ অনুবাদক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র।

বিবিধ

বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস, রাজনীতি, সংগীত, ভ্রমণকাহিনী, জীবনী প্রভৃতি নানা বিষয়ে বাংলাভাষায় বিচিত্র বই লেখা আরম্ভ হয়েছে, দেশ-বিদেশের ভালো ভালো বইয়ের অল্পবিস্তর অনুবাদও হচ্ছে। আশা করা যায় যে, অবিলম্বে এমন একদিন আসবে যখন কোনো বিষয় জানবার জন্যে আর আমাদের অন্য ভাষার মুখাপেক্ষী হতে হবে না।

আর-একটা কথা এখানে বলা উচিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরে শিক্ষিত মুসলমান কবিগণ বিভিন্ন সময়ে আরবি ফারসি গল্পেরও ধর্ম-পুস্তকের অনুবাদ প্রভৃতি করে গিয়েছেন। সেগুলির সংখ্যাও কম নয়। এই বইগুলি কিন্তু উল্টো দিক থেকে ছাপা। অর্থাৎ আমাদের পাঠ্য-

প্রভৃতি বইগুলি যে পাতায় শেষ হয়েছে, এ-সব বইয়ের আরম্ভ সেই পাতা থেকে। আরবি ফারসি অক্ষর লেখা হয় ডান দিক থেকে বাঁদিকে, সে-সব অক্ষরে এ ভাবে ছাপানো মানায়, কিন্তু বাঁদিক থেকে লেখ্য বাংলা অক্ষরে এরকম করে উল্‌টো ছাপানোর কোনো মানে হয় না।

স্বদেশী-আন্দোলন ও দেশের মহাপুরুষদের অবলম্বন করে বিভিন্ন ধারায় বহু গ্রন্থ রচিত হচ্ছে। ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য পরস্পর ওতপ্রোত। কাজেই সাহিত্যের গতির উপর পূর্বাপর লক্ষ্য রাখতে গেলেই সমাজ ও ধর্মের অল্পবিস্তর আলোচনা আপনিই এসে পড়ে। সে দিক দিয়ে জানার পক্ষে শিবনাথ শাস্ত্রীর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত ও সেকাল ও একাল, 'ম' কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত এমানুল হকের বঙ্গে সুফী প্রভাব— এই কখানি বই বিশেষ মূল্যবান।

বাংলাসাহিত্যের উন্নতির জন্যে দেশের বড়ো বড়ো লোকেরা বাংলা ১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ নামে একটি সমিতি স্থাপনা করেন। কেননা শুধু ব্যক্তিগত ও বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার দ্বারা কোনো সাহিত্যের সম্যক্‌ বিকাশ সম্ভব নয়। এই সমিতি থেকে নানাবিধ পুরোনো ও নতুন বই প্রকাশিত হয়। বাংলার বিভিন্ন স্থানে এই পরিষদের শাখা আছে। প্রতিবৎসর এক এক জায়গায় বাংলার সাহিত্যিকগণ সম্মিলিত হন, এ-সব সম্মিলনে প্রয়োজনীয় জ্ঞানগর্ভ বিষয়সমূহের আলোচনা হয়। এই পরিষদ থেকে একখানি পত্রিকাও বের হয় তাতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রভৃতি থাকে। কলকাতায় সাহিত্য পরিষদের নিজস্ব একটি বড়ো বাড়ি আছে, সেখানে অনেক পুরোনো পুঁথি, বই, মূর্তি ও ছবি প্রভৃতি সংগৃহীত হচ্ছে।

বাংলার সাময়িকপত্রের স্থানও উচ্চে। বাংলাভাষার প্রথম সাময়িকপত্র দিগ্‌দর্শন, সমাচারদর্পণ, বাংলাগেজেট, সমাচার-চন্দ্রিকা,

সংবাদ-কৌমুদী প্রভৃতি পত্রিকা সেকালে অর্থাৎ একশো বছর আগে প্রচলিত ছিল।

পরে বঙ্গবাসী পত্রিকার বহুল প্রচার হয়। ক্রমে ক্রমে হিতবাদী বসুমতী সঞ্জীবনীর অভ্যুত্থান ঘটে। বঙ্গবাসী, হিতবাদী ও বসুমতীর পরিচালকগণ বহুতর শাস্ত্রগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ আর খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণের গ্রন্থাবলী সহজে বাঙালি পাঠকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে সাধারণের পক্ষে জ্ঞানচর্চার পথ সুগম করে দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্‌যোগে সাহিত্য পরিষদ্‌ থেকে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজি মুদ্রিত হচ্ছে। শিক্ষিত বাঙালি এঁদের নিকট ঋণী, এ কথা মানতে হবে। বটতলার গ্রন্থপ্রকাশকগণও অনেক পুরানো বাংলা বই ছাপিয়ে সেগুলিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন, এ ক্ষেত্রে তাঁরাও আমাদের স্মরণীয়। বর্তমানে আনন্দবাজার ও যুগান্তর পত্রিকা জনপ্রিয়।

মাসিক পত্রিকার মধ্যে সেকালে বিবিধার্থসংগ্রহ, বঙ্গদর্শন, বালক, সাধনা, ভারতী প্রভৃতি চলত, আজকাল প্রবাসী, ভারতবর্ষ ও বসুমতী বেশি প্রচলিত পত্রিকা। এ ছাড়া স্বল্পজীবী সাময়িক পত্রিকার সংখ্যাও কম নয়। প্রতি বৎসরই বহু নতুন নতুন কাগজ বর্ষাকালে ব্যাঙের ছাতার মতো বেরচ্ছে এবং অচিরকালের মধ্যেই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এগুলির সংখ্যাও কম নয়।

জীবিত লোকের জীবনচরিত যেমন সম্পূর্ণ লেখা যায় না, তেমনি জীবিত ভাষায় কাহিনীও শেষ করা যায় না। কেবল অতীত আর বর্তমানের খানিকটা নিয়ে কিছু বলা চলে। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যের পরিণতির প্রতি লক্ষ করে, সেই অনুপাতে ভবিষ্যতের দিকে তাকালে তার ভাবী বিকাশ ও পরিণাম -সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যায়।

কয়েক বছর থেকে আবার সমস্ত জগতের সভ্যসমাজে চিন্তা ও ব্যবহারের ধারা দ্রুত বদলে আসছে। সমাজের প্রতিচ্ছবি হল সাহিত্য, সুতরাং সাহিত্যেরও যে বিষয় আর ভাব বদলাবে সে কথা বলা বাহুল্য। আগেকার সাহিত্যের একটি মূল ইঙ্গিত ছিল যে, ভালোর ফল ভালো, আর মন্দের ফল মন্দ। এই ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে সাহিত্যের রূপ একতরফা হয়ে থাকত।

যাকে বাইরে ভালো দেখছি সে হয়তো ভিতরে তার উলটো, আবার যাকে মন্দ বলেই জানি সে ভিতরে নিতান্ত নির্দোষ। সমাজের চাপে বৈধ-অবৈধের বিচারে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ভিতরকার স্বরূপের সত্য থাকে চাপা। সেইটেই আজকালকার সাহিত্যে (পদ্যে ও গদ্যে) ফুটিয়ে দেখানো হয়। এতে করে বিষয় হয়ে ওঠে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। রাশিয়ান ও ফরাসী লেখকরাই এইভাবের সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী 'পথিকৃৎ'। বাংলায় এই ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিভা-সম্পন্ন একদল লেখক দেখা দিয়েছেন। এই অতি আধুনিক ভাবের সাহিত্যকে হেলায়-শ্রদ্ধায় "তরুণ সাহিত্য" বলা হয়। অবশ্য তরুণবয়স্ক লেখকের লেখা বলে নয় কেননা প্রাচীন লেখকেও তা লিখছেন, ভাব তরুণ বলেই ঐ নাম। জনসাধারণের ভিতর এই-সব লেখার অত্যন্ত চাহিদা। কিন্তু আবার অনেক নিষ্প্রতিভ লেখকও যশস্বী লেখকদের ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়েছেন এ ক্ষেত্রে, নামের মোহে। যেমন দেশবিজয়ী বীরগণের পিছনে পিছনে চলে একদল অক্ষম দুর্বল কিছু সঞ্চয়ের আশায়।

এই নবোদীয়মান অতি-আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনা রয়েছে দূর ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে— একথা আগে বলা হয়েছে।

সামগ্রিক ভাবে সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্যে বর্তমান কালে কয়েকটি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'রবীন্দ্রস্মৃতি' পুরস্কার দিচ্ছেন এবং সাহিত্য অকাদমী কর্তৃক পুরস্কার দানের ব্যবস্থা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ

এতক্ষণ যে-সব আলোচনা করে আসা গেল তার ভিতর দুজন মনীষীর কথা বিশেষ কিছু বলা হয় নি। এঁরা হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রবি আর চন্দ্র যেমন আকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকার, তেমনি বাংলাসাহিত্য-আকাশের এঁরা।

এক-এক সময় এক-এক জন মহাপুরুষ আসেন অপ্রতিম শক্তি নিয়ে— কেউবা ধর্মে কেউবা কর্মে কেউবা রাজনীতিতে কেউবা সমাজ ও বিজ্ঞান প্রভৃতিতে। এঁদের প্রতিভা ও শক্তিতে জাতীয় জীবনের এক-এক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দেয়।

সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশে আমাদেরই সময়ে সর্বতোমুখী প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন তেমনি একজন মহাপুরুষ রবীন্দ্রনাথ। বারো তেরো বছর বয়স থেকেই ইনি কবিতা প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখতে আরম্ভ করেন। সাহিত্যের এমন কোনো দিক নেই যে দিকে ইনি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বই না লিখেছেন। এঁর লেখা সাহিত্যের কথা খুঁটিয়ে বলতে গেলে 'বাঁশবনে ডোম কানা'র মতো অবস্থা হয়। গান ও কবিতার তো কথাই নেই। উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, ছোটোগল্প, শিশুসাহিত্য, প্রবন্ধ, ধর্ম, সমাজ, বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে এঁর লেখা বই অতুলনীয়। আশ্চর্যের বিষয়, এখন স্বদেশ, মাতৃভাষা আর অস্পৃশ্যতা নিয়ে যে-সব আন্দোলন চলছে, প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার রবীন্দ্রনাথের বইয়ে তার সূচনা রয়েছে।

এশিয়াবাসীর মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান। সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে যিনি যখন পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হন তিনিই ঐ নোবেল পুরস্কারের অধিকারী হন। ইনি নোবেল প্রাইজ পাওয়াতে সমস্ত দেশময় সাড়া পড়ে গেল। যে-বাংলা

ভাষা বাইরের লোকের কাছে অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত ছিল সেই বাংলা পৃথিবীর বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে আদর পেল, স্থান পেল। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পান যে-বইখানির জন্যে সেখানি তাঁর দু-একখানি বাংলা বইয়েরই অনুবাদ। ইংরেজি বইখানির নাম দিয়েছিলেন গীতাঞ্জলি।

আমাদের বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদেরই মাতৃভাষার বিশেষ কোনো স্থান ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল থেকে এ সম্বন্ধে লেখালেখি করেন। সুখের বিষয় সম্প্রতি বাংলাভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বই না পড়লে আজকাল আমাদের শিক্ষাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়; তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচিত না হলে কোনো বাঙালিই এখন শিক্ষিত বলে গণ্য হন না।

শরৎচন্দ্র

এইবার শরৎচন্দ্রের কথা। এঁর লেখার ভিতর দিয়ে যেন সমগ্র বাংলাদেশ আর বাঙালির সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগ মূর্ত হয়ে উঠেছে। এইজন্যে এঁর বই এত জনপ্রিয় যে, যে বাঙালি সামান্য লেখাপড়া জানে সেও এঁর বই দরদ দিয়ে পড়ে থাকে।

বর্তমানে উপন্যাসের ধারা এঁর প্রভাবে বদলে গিয়েছে, এমন-কি শিক্ষিত লোকের চিন্তার গতি পর্যন্ত। বিশেষত বাংলার মেয়েদের আর সমাজের অন্তরের চিত্র এঁর লেখায় এত স্পষ্ট যে, তা পাঠককে অভিভূত করে ফেলে।

এতক্ষণ বাংলাসাহিত্যের সম্বন্ধে মোটামুটি অনেক কথা বলা গেল, আর বাকিও রইল অনেক কথা। বাংলার মাটি বাংলার ঋতু যেমন আমাদের দেহকে প্রতিনিয়ত পুষ্টি দান করছে, তেমনি বাংলার ভাষাও আমাদের মনকে শতদল পদ্মের মতো বিকশিত করে জগতের মাঝে

আমাদের বরণীয় করে তুলছে। এইবার কবিগুরুর একটি কবিতা উচ্চারণ করে আমাদের বক্তব্য শেষ করি :

বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাদল
বহে যায় শত স্রোতে রসবন্যা বেগে,
কভু বজ্রবহ্নি কভু স্নিগ্ধ অশ্রুজল
ধ্বনিছে সংগীতে ছন্দে তারি পুঞ্জমেঘে,
বঙ্কিম শশাঙ্ককলা তারি মেঘজটা
চুম্বিয়া মঙ্গলমন্ত্রে রচে স্তরে স্তরে
সুন্দরের ইন্দ্রজাল, কত রশ্মিচ্ছটা
প্রত্যূষে দিনের অন্তে রাখে তারি 'পরে
আলোকের স্পর্শমণি। আজি পূর্ববায়ে
বঙ্গের অম্বর হতে দিকে দিগন্তরে
সহর্ষ বর্ষণধারা গিয়েছে ছড়ায়ে
প্রাণের আনন্দবেগে পশ্চিমে উত্তরে।

ক. কয়েকটি অপ্রচলিত শব্দের অর্থ

আখেটী— শিকারী

আঙ্গি— ভিতরের মশলা যাবার জন্যে সরুসরু করে চেরা

আয়তি— সধবার চিহ্ন

আমানি— পান্তাভাতের জল

উছটি— পায়ের আঙুলের চুটকি

একুশে— শিশুর জন্মের পর একুশদিনে করণীয় ষষ্ঠীপূজা

কাউঠা— কচ্ছপ

কাছুটি— কোমরবন্ধ

কালীদহ— সমুদ্রের মধ্যে একটি স্থান

কুজ— মঙ্গল (গ্রহ)

কোঁড়া— ছোট্ট চারা গাছ

খণ্ড— খাঁড়, গুড়

গটিয়া গাবর— গটিয়া— দৃঢ়শরীর, গাবর— নৌকার মাল্লা

গাড়র— ভেড়া

গাবী— গোরু

ঘাঘর— ঘুঙুর

চ্যাংমুড়ি কানী— সিজের গাছ মনসার প্রিয় গাছ, যেমন শিবের বেলগাছ, বিষ্ণুর তুলসীগাছ। তৈলঙ্গী ভাষায় ঐ গাছের নাম চ্যাংমুড্ডু। বোধ হয় তার থেকে মনসার এই নাম। আবার চ্যাংমাছের মতো যার মুখ, এই অর্থেও চ্যাংমুড়ি বলা হয়েছে। কানা—দুর্গা ঝগড়া ক'রে মনসার এক চোখ কানা করে দেন। (মনসার এই নাম নিয়ে নতুন অনেক সন্ধান হচ্ছে)।

ছানী— পুরো কথা "ভোখছানি", ছন্দের জন্যে মাঝে "লাগে" কথাটা বসেছে। ভোখছানি মানে ক্ষুধায় অবসন্নতা।

জাউ— (যবাগূ) যব দিয়ে হালুয়ার মতো করে রাঁধা খাবার

জাত— যাত্রা, উৎসব

ঝারি— ঘটি

টঙি— উঁচু বৈঠকঘর, জলটুঙ্গি

তলিত— ভাজামাংস

তেগুঁড়ি— তে— তিন, গুঁড়ি— গুটি, হাঁড়ি বসাবার জন্যে উনুনের ঝিঁকের মতো মাটির তৈরি তিনটে উঁচু গুটি।

দঢ়— (দৃঢ়) দক্ষ, পটু

নফর— চাকর

দেহালা— কচিছেলে স্বপ্নে কখনো হাসে কখনো কাঁদে। লোকে বলে তার সঙ্গে মা-ষষ্ঠী খেলা বা আলাপ করেন। দেব-খেলা বা দেবালাপ শব্দ থেকে দেহালা কথাটা এসেছে।

নেতের কাপড়— মিহি কাপড। নৃত্য থেকে নেত শব্দ। নাচার সময় মিহি কাপড পরা হয়। তা থেকে সাধারণ ভাবে মিহি কাপড়ের নাম হয়েছে নেতের কাপড। সংস্কৃতে "নেত্র" নামেও একরকম কাপড়ের কথা আছে।

পাথী— (পচ্ছি) ছোটো ঝুড়ি অথবা থলে

পাটন— (পত্তন) নগর। বিশেষত নদী বা সমুদ্রের তীরবর্তী নগর।

ভরা— নৌকা

মধুকর— বাংলার সদাগরদের বাণিজ্যে যাওয়ার নৌকার নাম

রসবাস— মসলা

লোহ— জল

বাগুরা— জাল

বার— যে ঘটে দেবতার পূজা হয় সেই ঘটের জল অথবা জলসুদ্ধ ঘট

বহিত্র— নৌকা

বুড়ি— ডুবি

হেঁদাল— (হিন্তাল) একরকম পাহাড়ে গাছ, যার গন্ধে সাপ ভয় পায়। হেঁদালের লাঠি কাছে থাকলে নাকি সাপ কাছে ঘেঁষে না।

খ. কালানুক্রমণ

নীচের বৎসর-সংখ্যাগুলি খ্রীস্টাব্দের। খ্রীস্টাব্দ থেকে ৫৯৩ বছর বাদ দিলে মোটামুটি বাংলা সন পাওয়া যায়। * তারাচিহ্ন দেওয়া বছর আনুমানিক জীবৎকাল; ব্যক্তির নামের পর আগেকার সংখ্যা জন্মের, পরেরটা মৃত্যুর।

১. কবি ও লেখকদের জীবনকাল

কৃত্তিবাস— জন্ম-তারিখ খুব সম্ভবত ১৩৯৯, ১২ই জানুয়ারি; মৃত্যু-তারিখ অজ্ঞাত। ১৪১৭-১৮ সালে গৌড়েশ্বরের দরবারে সম্মানলাভ।

চণ্ডীদাস— *১৪৫০

চৈতন্যদেব— ১৪৮৬-১৫৩৪

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী— *১৬০০

কাশীরাম দাস— *১৬০০

কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রায়— *১৭১২-১৭৬০

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন— ১৭২০-১৭৮১

রামরাম বসু— *১৭৫৭-১৮১৩

উইলিয়ম কেরি— ১৭৬১-১৮৩৪

(জীবনের শেষ ৪১ বৎসর বাংলায় বাস)

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার— ১৭৬২-১৮১৯

রামমোহন রায়— *১৭৭৪-১৮৩৩

দাশরথি রায়— ১৮০৪-১৮৫৭

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত— ১৮১১-১৮৫৯

প্যারীচাঁদ মিত্র— ১৮১৪-১৮৮৩

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর— ১৮১৭-১৯০৫

মদনমোহন তর্কালংকার— ১৮১৭-১৮৫৮

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর— ১৮২০-১৮৯১

অক্ষয়কুমার দত্ত— ১৮২০-১৮৮৬

রামনারায়ণ তর্করত্ন— ১৮২২-১৮৮৬

রাজেন্দ্রলাল মিত্র— ১৮২২-১৮৯১

মধুসূদন দত্ত— ১৮২৪-১৮৭৩

ভূদেব মুখোপাধ্যায়— ১৮২৫-১৮৯৪

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়— ১৮২৭-১৮৮৭

দীনবন্ধু মিত্র— ১৮২৯-১৮৭৩

বিহারীলাল চক্রবর্তী - ১৮৩৫-১৮৯৪

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— ১৮৩৮-১৮৯৪

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়— ১৮৩৮-১৯০৩

কেশবচন্দ্র সেন— ১৮৩৮-১৮৮৪

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর— ১৮৪০-১৯২৬

কালীপ্রসন্ন সিংহ— ১৮৪০-১৮৭০

গিরিশচন্দ্র ঘোষ— ১৮৪৩-১৯১১

নবীনচন্দ্র সেন— ১৮৪৬-১৯০৯

রমেশচন্দ্র দত্ত— ১৮৪৮-১৯০৯

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর— ১৮৪৯-১৯২৫

অমৃতলাল বসু— ১৮৫৩-১৯২৯

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী— ১৮৫৩-১৯৩২

স্বর্ণকুমারী দেবী— ১৮৫৫-১৯৩২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— ১৮৬১-১৯৪১

স্বামী বিবেকানন্দ— ১৮৬৩-১৯০২

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়— ১৮৬৩-১৯১৩

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— ১৮৭৬-১৯৩৮

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত— ১৮৮২-১৯২২

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়— ১৮৮৬-১৯৩০

২. কয়েকটি স্মরণীয় বৎসর

১৫১৭— পোর্তুগীজদের প্রথম বাংলায় আগমন।

১৬৭৪— পোর্তুগীজদের পাদ্রি দোম্ আন্তনিও-কর্তৃক 'ব্রাহ্মণ-রোমানকাথলিক সংবাদ' নামক প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা।

১৭৪৩— পোর্তুগীজ পাদ্রি মনোএল্‌দা আস্‌সুম্প্‌সাওঁ কর্তৃক 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ', নামক দ্বিতীয় বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা।

১৭৪৩—উক্ত গ্রন্থখানি পোর্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরে রোমান লিপিতে মুদ্রিত হয়। এখানিই প্রথম মুদ্রিত বাংলাগ্রন্থ।

১৭৫২— অন্নদামঙ্গল-কাব্য রচনা।

১৭৫৭— পলাশির যুদ্ধ ও ইংরেজের জয়লাভ।

১৭৬৫— 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'-নামক ইংরেজ বণিক-সম্প্রদায় কর্তৃক বাংলার দেওয়ানিলাভ ও ইংরেজ-প্রভুত্বের সূচনা। [১৬৫১

সালে ইংরেজদের প্রথম বাংলায় আগমন ও ১৬৯১ সালে তাঁদের বাংলায় বসবাসের আরম্ভ।]

১৭৭৮— চার্ল্স উইলকিন্স্ কর্তৃক সর্বপ্রথম বাংলা ছাপার হরফ নির্মাণ ও হাল্‌হেড্‌-কৃত বাংলাব্যাকরণ মুদ্রণ : এটিই বাংলা লিপিতে মুদ্রিত প্রথম পুস্তক।

১৭৯৯— শ্রীরামপুরে খ্রীস্টান মিশন প্রতিষ্ঠা।

১৮০০— ফোর্টউইলিয়ম কলেজ স্থাপন ও বাংলার অধ্যাপকপদে উইলিয়ম কেরির নিয়োগ।

১৮০১— রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র' প্রকাশ ; ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার প্রথম পুস্তক ও বাঙালির লেখা বাংলা হরফে ছাপা প্রথম বই।

১৮০৪— শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ-কর্তৃক কৃত্তিবাসের রামায়ণ মুদ্রণ।

১৮১৫— রামমোহন রায়ের প্রথম প্রকাশিত পুস্তক 'বেদান্তগ্রন্থ'।

১৮১৮— শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশ ; বাঙালি-পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'বাংলা গেজেটি' গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও হরচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রকাশ।

১৮৪৭— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত পুস্তক 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'।

১৮৫৪— বিদ্যাসাগর-কৃত 'শকুন্তলা' প্রকাশ, এবং 'মাসিক পত্রিকা' নামক সাময়িক কাগজে প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর-এর 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক উপন্যাসের ক্রমশ প্রকাশ।

১৮৫৭— সিপাহি বিদ্রোহ ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

১৮৫৮— 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থ প্রকাশ।

১৮৬০— মধুসূদনের প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব' প্রকাশ ; বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন।

১৮৬১— মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশ ; রবীন্দ্রনাথের জন্ম।

১৮৬২— কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পেঁচার নক্সা' প্রকাশ।

১৮৬৫— বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ।

১৮৭২— বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ।

১৮৭৮— রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'কবিকাহিনী'।

১৮৯১— রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশ।

১৮৯৩— বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠা।

১৯০১— রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্যায়) প্রকাশ।

১৯১৩— রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তি।

১৯১৪— প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদিত 'সবুজ পত্র' প্রকাশ।